মনের কথা

ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

মনের কথা

কলিকাতা আর, জি, কর মেডিক্যাল
কলেজের অধ্যাপক

ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

 [মূল্য ২৲ টাকা

১১নং কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীঅপর্ণা ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকার
১১নং কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার
কলিকাতা-৪

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মুদ্রাকর শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিলাস প্রেস
২১।এ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা।

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্
গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া
ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।৬

অর্থাৎ মনই জীবের দেহ, গুণ ও কর্ম্ম সৃষ্টি করে, এবং সেই মনই মায়া সৃষ্টি করে যাহাদ্বারা জীবের সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

ভূমিকা

ব্যক্তিবিশেষ কি উপায় অবলম্বন করিলে মনকে সুস্থ রাখিয়া উন্নত জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে।

মন একাধারে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চিত্তবৃত্তিকে মন বলা হইয়া থাকে। মন সর্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক অন্তরেন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার উপর মানসিক উন্নতি নির্ভর করে এবং মানসিক উন্নতির উপর যে কোন ব্যক্তির তথা যে কোন জাতির সর্ব্বপ্রকার গৌরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব মানসিক উৎকর্ষতায়ই সম্ভব।

যে কোন ব্যক্তির শরীরকে সুস্থ রাখিবার যেরূপ প্রয়োজন, মনকে সুস্থ রাখিবারও সেইরূপ প্রয়োজন। সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনেই মানুষ তাহার যাবতীয় করণীয় কার্য্য সুষ্ঠুরূপে করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলে জীবনের উন্নতি যে ব্যাহত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মনকে সুস্থ রাখিতে হইলে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন। কামনা বাসনা তথা হৃদয়াবেগ সংযত করিতে অসমর্থ হইলে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হইয়া থাকে।

বিনিয়ন্ত্রিত সহজাত প্রবৃত্তি যে, ব্যক্তিবিশেষকে অত্যধিক বিষয়াসক্ত করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের ভোগ-লিপ্সা যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে চতুর ব্যবসায়িগণ নানা প্রকারে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে।

জীব সাধারণতঃ বিষয়-বিমুগ্ধ। সংযমী না হইলে নানাপ্রকার প্রলোভনে বিব্রত হইবার আশঙ্কা প্রবল এবং তজ্জন্য পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যহীন হওয়া সম্ভব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে হইলে মানুষকে সংযমী হইতেই হইবে। বুদ্ধি বিবেচনা ও ঈশ্বরানুরক্তি সংযমী হইতে সাহায্য করিয়া থাকে। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে ব্যক্তিবিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকারের কোন মৌলিকত্ব নাই; সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য সমূহ সঙ্কলিত করা হইয়াছে মাত্র। জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অধীত বিষয়ের অনুধাবন দ্বারা উপকৃত হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইবে। ইতি—

১লা মাঘ
১৩৫৮ সাল।

শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বিষয় সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	সাঞ্জস্য	সামঞ্জস্য
১৩	৮	বিবিত্র	বিচিত্র
১৩	শেষ	সমীচীগ	সমীচীন
১৮	১৬	পরমত্মা	পরমাত্মা
৩২	শেষ	করিাবার	করিবার
১১৭	১১	হরিকথ	হরিকথা
১২৫	১৬	মানুষ্যদিগের	মনুষ্যদিগের

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

মনের কথা

প্রথম অধ্যায়

প্রাণীমাত্রই দুইটি মূল প্রয়োজনের অধীন। এক বাঁচিয়া থাকা ও জীবন উপভোগ করা, অপর বংশরক্ষা বা নিজেকে পুনরুৎপাদন করা। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবানু হইতে বৃহদায়তন জীব পর্য্যন্ত সকলেই এই নিয়মের অধীন। যে কোন জীবন্ত প্রাণী, সে উদ্ভিদই হউক অথবা জীবজন্তুই হউক প্রত্যেকের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবল প্রয়াস লক্ষিত হয়। ইতর প্রাণিবর্গের জীবনে এই বৃত্তি দুইটীর কার্য্যই প্রধান এবং ইহাদের দ্বারাই উহাদের সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। আদিম মানবের অবস্থাও প্রায় অনুরূপই ছিল। আহার বিহার ও বংশরক্ষার প্রেরণা দ্বারাই তাহার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। অবস্থাও ইহার অনুকূল ছিল।

জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক জল, বায়ু ও আহার্য্য। আদিম মানবের ইহার কোনটীরই অভাব ছিল না। বিনা আয়াসে বা অল্প চেষ্টাতেই সে এই সকল সংগ্রহ করিতে পারিত। সুতরাং স্বচ্ছন্দেই তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। আদিম মানবের বংশরক্ষার ইচ্ছাও কোন জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বংশবৃদ্ধির জন্য যে প্রেরণা তাহার জন্য স্ত্রী বা পুরুষের খুব ভাবিবার প্রয়োজন

হইত না। স্বচ্ছন্দ জীবনে ইহা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। বংশবৃদ্ধির প্রেরণাবশে মানুষের সহজাত বৃত্তি সহজেই চরিতার্থ হইত।

কিন্তু মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সকল ব্যক্তির এবং সকল জাতিরই আন্তরিক ইচ্ছা যে, তাহারা জনসমাজে অগ্রগণ্য ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব মনুষ্যজাতি আর আদিম অবস্থায় থাকিতে পারিল না, তাহার কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সে সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর আসিয়া পড়িল কতকগুলি বাধানিষেধ। ফলে তাহাকে প্রতিপদে সামাজিক বিধি, রাষ্ট্রবিধি ও ধর্ম্মানুশাসন প্রভৃতি মানিয়া চলিতে হইতেছে, নতুবা তাহার পক্ষে উত্তম জীবনযাপন সম্ভব নহে। এই সকল বিধিনিষেধের তাড়না সময় সময় তাহার নিকট এরূপ অসহনীয় হইয়া উঠে যে, তাহারই স্বকৃত সভ্যতা তাহার নিকট অভিশাপস্বরূপ মনে হয়। সভ্যতার নানা জটিল আবর্ত্তে তাহার মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পরিয়াছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার চাপ রোধ করিবার জন্য মানবের নূতন নূতন উপায়ের সন্ধান করিতে হইবে যাহাতে তাহার জীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে পারে। তাহাকে এমনভাবে চলিতে হইবে যেন তাহার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার উন্নতির ব্যাঘাত না ঘটাইতে পারে।

মানব তাহার ধীশক্তির সাহায্যে বর্ত্তমান সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে তাহার সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণাকে

অবহেলা করিয়াছে ও দমন করিয়াছে। এই সহজাত বৃত্তি-গুলির অবশ্য প্রয়োজন আছে, এবং ইহাদের শক্তিও প্রবল। বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে এই সহজাত বৃত্তিগুলি আদিম যুগের মত আর চরিতার্থ হইতে পারিতেছে না। মানুষ যতই সভ্য হইতেছে ইহাদের প্রেরণার স্ফুরণও ততই বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। এই সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ পুনরায় সেই আদিম যুগে ফিরিয়া যাউক ইহা কেহই চাহিবে না। তাহাকে এই বৃত্তিগুলির সহিত বর্ত্তমান সভ্যতার বিধিনিষেধ-গুলির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে হইবে। তাহাকে এমনভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, এমনভাবে চিন্তা করিতে শিখিতে হইবে এবং এমনভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে যাহাতে সুখ, স্বাস্থ্য ও চরিত্রের অধিকারী হইয়া সে শান্তিময় জীবনের অধিকারী হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে মানুষকে এমনভাবে চলিতে হইবে যাহাতে তাহার সহজ ও সরল জীবন যাপন সম্ভব হয়; কারণ মানুষকে জীবনে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় যাহাতে তাহার স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হইতে পারে। মানসিক সুস্থতা রক্ষা করিতে পারিলে মানুষ বহু অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

মনকে সুস্থ রাখিতে হইলে মানুষকে (১) তাহার নিজের বিষয়, (২) সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সহিত তাহার সম্পার্কের বিষয়, এবং (৩) প্রকৃতির উপর তাহার নির্ভরশীলতার বিষয় ভালরূপে বুঝিতে

হইবে। এক কথায় বলা যায়, পরিবেশের সহিত সুবিবেচনার সহিত নিজের সাঞ্জস্য বিধানই মন সুস্থ রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান একান্ত আবশ্যক।

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেককে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা পুরাপুরিভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এবং দৃঢ়চিত্তে সেই পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, অর্থাৎ নিজেকে যথোচিত ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ হওয়া সঙ্গত ছিল তাহা ভাবিয়া লাভ নাই;

"আপন মনের মতো
সঙ্কীর্ণ বিচার যতো
রেখে দাও আজ"

—রবীন্দ্রনাথ

এই কথা তাহার স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহার পরিবেশ কিরূপ হইলে আশানুরূপ হইত তাহা চিন্তা করা বৃথা। যাহা প্রকৃত অবস্থা তাহা মূর্খের মত অস্বীকার করিয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করা সমীচীন নহে। সত্য অবস্থাকে স্বীকার করিয়া তদনুসারে নিজেকে প্রস্তুত রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

পরিবেশের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান সকল সময় সহজ নহে, তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে। সকলেরই মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং মনকে সুস্থ রাখিবার উপায়সকলও জানিয়া রাখা আবশ্যক। মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সুস্থ মনের ক্রিয়া এবং কিরূপে মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয় তাহা জানা প্রয়োজন। তাহা জানা থাকিলে যে সকল কারণে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দুই প্রকারে চেষ্টা করা যাইতে পারে—

প্রথমতঃ, শিশুকে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে সে যথোচিত ভাবে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারে এবং তাহার চিন্তাধারা সুস্থভাবে প্রবাহিত হয়; সে যেন ঘটনাগুলিকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ বুঝিতে সক্ষম হয়। শিশুকে যত্নপূর্ব্বক উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে সহজেই মনকে সুস্থ রাখিতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা। ইহা খুবই সম্ভব যে, কেহ কেহ হয়ত শিশুকালে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পায় নাই। সেই ক্ষেত্রে পরিণত বয়সেও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিসকল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

কাহারও সামান্য মানসিক বৈকল্য লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ যদি বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তবেই সে সহজে নিরাময় হইতে পারে। সামান্য মানসিক বৈকল্য অবহেলা করিলে পরিণামে তাহা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে।

সকলেরই সুস্থ মনের লক্ষণসমূহ এবং মন কেন অসুস্থ হয় তাহা জানা থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে অনেক দুর্ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইবে। সাধারণতঃ মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার ফলে প্রাথমিক অবস্থায় প্রায়শঃ উহা অবহেলিত হইয়া থাকে, এবং রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করে তখনই কেবল চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। অথচ পূর্ব্বে সামান্য যত্ন লইলেই ব্যাধির প্রতিরোধ হয়ত সম্ভব হইত।

শারীরিক অবস্থার সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ।

শারীরিক কারণে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। মস্তিষ্কে আঘাত পাইলে অথবা মস্তিষ্কের পীড়া হইলে স্নায়ুকোষ সকল নষ্ট হইতে পারে। তাহার ফলে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্কের আঘাত কিংবা গুরুতর পীড়া ব্যতীত দেহের অপরাপর অবস্থা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। তবে কেহ যদি তাহার দৈহিক অবস্থা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামায়, সে কথা স্বতন্ত্র।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শারীরিক অবস্থাগুলি বিবেচনা করা যাইতে পারে—

শারীরিক শ্রম—অনেকের ধারণা যে, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে মন অসুস্থ হইয়া থাকে। কিন্তু সে ধারণার কোন ভিত্তি নাই। শারীরিক পরিশ্রম এবং তজ্জনিত ক্লান্তি সুস্থ লোকের চিত্তবৈকল্য ঘটাইতে পারে না, বরঞ্চ পরিমিত পরিশ্রম মনকে আরও প্রফুল্ল করিয়া থাকে। এমন কি কঠোর পরিশ্রমও মানসিক রোগের কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে হয় অথবা কাজ করিবার কালে মেজাজ নষ্ট হয়, তবেই মানসিক অসুস্থতা ঘটিতে পারে। মোট কথা, কোন কাজ করিতে যে পরিশ্রমের আবশ্যক তাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য কখনও নষ্ট হয় না।

দৈহিক পীড়া—কখনও কখনও জ্বরাদি পীড়ার ফলে চিত্তবিভ্রম দেখা দেয়। আবার কখনও কখনও রোগের প্রকোপ কমিবার পর চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়। যদি কাহারও এরূপে মানসিক অসুস্থতা দেখা যায়, তবে সাধারণতঃ তাহা স্বল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে এবং শীঘ্রই তাহা নিরাময় হয়। এই স্বল্পস্থায়ী চিত্ত-বিভ্রমের জন্য রোগীর ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই।

আবার এমনও দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল রোগ ভোগের ফলে কাহারও কাহারও চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। ইহার কারণ এই

যে, দীর্ঘকাল রোগভোগ করিলে স্বভাবতই লোকে নিজের উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেয় এবং তাহাই অনিষ্টের মূল। যখন দেখা যাইবে যে, কোন ব্যক্তি নিজের উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিতেছে, আপন স্বার্থকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করিতেছে, এবং নিজের দেহ ও দেহাশ্রিত বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ দেখাইতেছে, তখনই তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। স্বার্থপরতা মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে খুবই শক্তিশালী।

দেহের ওজন হ্রাস পাইলে কোন কোন লোক বিষাদগ্রস্ত হয়। দেহের ওজন নানা কারণে হ্রাস পাইতে পারে, তজ্জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অবসাদগ্রস্ত হইবার কোন সার্থকতা নাই।

শারীরিক কারণে মনের সুস্থতা কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইতে পারে তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া আমরা শারীরিক কারণগুলির উপর প্রাধান্য দিয়া থাকি।

বয়ঃসন্ধির কালে অনেক সময় চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে এবং প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় নানারূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে সংসার বিষয়ে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়, এবং নূতন করিয়া সংসারকে বুঝা যায়। বালিকাদের বয়ঃসন্ধির কালে ভাবান্তর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাহারও কাহারও ঋতুমতী হইবার সময়ে অথবা গর্ভাবস্থায় চিত্ত-

চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই ভাবান্তর স্বল্পকালস্থায়ী মাত্র, সে জন্য পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে যেন অস্থির হইয়া না পড়েন। অন্যান্য সকলে ব্যাকুল হইলে রোগিণীর অধিকতর কাতর হইবার সম্ভাবনা।

প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় অনেকের মনে বিষাদের ভাব আসে। কোন কোন সময় এই বিষাদ ভাব কয়েক মাস স্থায়ী হইতে পারে। যদি ঐ সময়ে ঠিকমত চলা না যায় তবে গুরুতর মনোবিকার ঘটিতে পারে।

দৈনন্দিন অভ্যাস—বুদ্ধিমান লোক এরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইবেন যাহাতে বিচক্ষণতার সহিত জীবন যাপন করিতে পারা যায় এবং সৎ-চিন্তা ও সৎ-বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকা যায়। সৎজীবন যাপন, ভগবানে বিশ্বাস এবং ভগবানের নাম স্মরণ মানুষকে সুস্থ মনের অধিকারী করে।

প্রত্যেকেরই জীবনকে সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য যাহাতে কাজ, বিশ্রাম, ব্যায়াম এবং আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে করা সম্ভব হয়। ইহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে সুষ্ঠু জীবনধারা ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি কাজ ও বিশ্রাম, খেলা ও আনন্দ ভোগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে না করে তবে এই অর্বাচীনতার ফল এক সময়ে তাহাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে

হইবে। অনতিবিলম্বে একদিন সে দেখিবে যে, সে শারীরিক বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে লোক কোন কাজ না করে সে কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে। মানসিক অশান্তি অলস লোকেরাই অধিক ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীহরির নাম স্মরণে রাখিয়া মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিলে মানসিক অসুস্থতা আসিতে পারে না। যে কোন ভাবে কাজ করিলেই চলিবে না, কাজে উৎসাহ ও আনন্দ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রত্যেক লোকেরই **বিশ্রাম** প্রয়োজন। কাহার কত সময় বিশ্রাম আবশ্যক তাহা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন, কাহারও কাহারও ৯ ঘণ্টা হইলেই ভাল হয়। যাহারা মনে করে অধিক সময় কাজ করিয়া অধিক উপার্জ্জন করা ভাল, তাহাদের ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্রামবিহীন কাজ অচিরেই স্বাস্থ্য ভগ্ন করিবে।

যাহাদের কাজ করিবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের কাজ করিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা বিশ্রাম লওয়া প্রয়োজন।

ব্যায়াম—নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিলে শরীর কেবল সুস্থ থাকে তাহাই নহে, মানসিক চঞ্চলতাও হ্রাস পায়। কি প্রকার ব্যায়াম করিলে উপকার পাওয়া যাইবে তাহা ব্যক্তিবিশেষের দেহের

অবস্থার উপর নির্ভর করে। সকল প্রকার ব্যায়াম প্রত্যেকের উপযোগী নহে, এবং ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়া অনুপযোগী ব্যায়াম করিলে স্বাস্থ্যহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ যাহাদের অন্য কোনপ্রকার ব্যায়াম করার সুযোগ হয় না, তাহাদের প্রত্যহ ৩ মাইল হইতে ৫ মাইল হাটিয়া বেড়াইলে শরীর ও মন ভাল থাকে।

খেলা করিলে স্বভাবতই মানসিক চঞ্চলতা (ভাবাবেগ) প্রশমিত হয় এবং সেই খেলার সময়ে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য সাংসারিক দুশ্চিন্তা ভুলিতে পারা যায়। কাজ করা যেমন প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং দায়িত্বপূর্ণভাবে করিতে হয়, খেলার উদ্দেশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। খেলার সময় "নিষ্প্রয়োজনীয়" ব্যাপার লইয়া সময় অতিবাহিত করা হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক খেলার ফলাফলের উপর এরূপ গুরুত্ব আরোপ করে এবং খেলাকে এমন গুরুগম্ভীরভাবে লইয়া থাকে যে, তাহাতে খেলার উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়।

শিশুদের খেলা করা নিত্যপ্রয়োজন। বয়স্কদেরও যে কোন প্রকার খেলা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে সাংসারিক ভাবনা হইতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

খাদ্য—প্রয়োজনমত হওয়া আবশ্যক। পরিমিতাহারী ব্যক্তি সহজে রোগভোগ করে না। সামান্য ভাবে চা, তামাক, কফি

প্রভৃতি খাইলে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, কিন্তু এই সকল দ্রব্য মাত্রামত হওয়া প্রয়োজন। যাহাদের মানসিক শক্তি কম তাহারা খাদ্যদ্রব্য লইয়া খুব বাচবিচার করে। ফলে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার শুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

খাওয়াতে অত্যধিক বাচবিচার করিলে নিজের উপর অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত মনোযোগই (অভিনিবেশ) দুঃখের কারণ হয়, সুতরাং ইহা বর্জ্জনীয়। সহজ কথায় বলিতে হয় যে, কোন বিষয়েই আতিশয্য মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে।

কোন ব্যক্তিবিশেষের খাদ্য শুধু তাহার চিকিৎসার জন্যই পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইতে পারে, নতুবা নহে। খাদ্য তালিকায় রদ বদল করা যায়, কিন্তু মৎস্যাহারী লোককে একদিনেই নিরামিষাশী করার কোন সার্থকতা নাই। আহার্য্য বস্তু লইয়া অত্যধিক বাচবিচার যেমন বর্জ্জনীয়, সেইরূপ যথেচ্ছ আহারও দূষণীয়। সংযম সর্ব্বত্র পালন করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা মানসিক অসুস্থতা ঘটাইতে পারে না। তবে যাহারা স্নায়ু-দুর্ব্বল স্বভাবের লোক তাহারা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগিয়া থাকে। অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি কোষ্ঠ পরিষ্কার হইল কি না তাহা লইয়া দুশ্চিন্তা করিয়া থাকে এবং নানারূপ জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করে। প্রত্যহ জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করিলে স্বাভাবিক

ভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার বিঘ্ন জন্মে। সাধারণভাবে ইহা বলা যায় যে, প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যহ দুইবার পায়খানায় যাওয়া কর্ত্তব্য—একবার প্রাতঃকালে, দ্বিতীয়বার সন্ধ্যার পর। পায়খানায় যাঁইয়া অন্ততঃ ১৫ মিনিট থাকিতে হইবে। যদি তাহার পূর্ব্বেই মলত্যাগের কার্য্য সমাপ্ত হয়, তবে ১৫ মিনিট থাকিবার প্রয়োজন নাই। পায়খানায় যাইবার পর মলত্যাগ হউক বা না হউক, তবুও প্রত্যহ দুইবার পায়খানায় যাইয়া বসিলে সাধারণতঃ জোলাপের ঔষধের কোন প্রয়োজন হইবে না এবং কোষ্ঠবদ্ধতাও নিরাময় হইবে।

অভ্যাস ও চিন্তন।

অভ্যাসের উপর জীবনের সুখ শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম, ব্যায়াম, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। অভ্যাসের কথা বলিতে হইলে কেমন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে এবং বাহিরের ঘটনার ও অবস্থা সকলের উপর কিরূপ মনোভাব রাখিতে হইবে তাহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় করে। কোন কিছু ভাবিবার সময় অথবা চিন্তা করিবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, সেরূপ ভাবনায় বা চিন্তায় তাহার কি ফল লাভ হইবে। কোন ঘটনার মর্ম্ম বুঝিবার সময় ভাবাবেগে চালিত হওয়া সমীচীন নহে। যে

ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহা বাস্তবতার মাপকাঠিতে বিচার করিতে হইবে। সেই ঘটনা ইচ্ছানুরূপ হউক বা না হউক, তাহা আত্ম-নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। যে কোন ঘটনাকেই তাহার পূর্ব্বাপর অন্যান্য ঘটনার সহিত বিচার করিতে হইবে, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিলে ভুল হইবে।

কোন ঘটনা ঘটিলে মানুষ সাধারণতঃ দুই প্রকারে চিন্তা করিয়া থাকে—

১। কিরূপে ঘটনাটী সংঘটিত হইল, ইহার কি কারণ এবং ইহার কি পরিণতি হইতে পারে।

২। ঘটনাটীকে পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যাহা ঘটিল তাহা লইয়া ভাবনা করা।

প্রথমোক্তরূপে যাহারা ঘটনাটীর বিষয়ে চিন্তা করে, তাহারা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া নিজেকে সে অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে এবং তদনুসারে জীবনের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে প্রথমোক্ত চিন্তা-ধারাই অনুকূল।

অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার লইয়া ভাবনা করিলে মানসিক স্বাস্থ্য সহজেই নষ্ট হইবে। কল্পনাবিলাসী ব্যক্তি কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না, এবং সেই ব্যক্তি অচিরেই স্বাভাবিক চিন্তা করিবার ও কাজ করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়।

ভাববিলাসী ব্যক্তির বাস্তব সত্তাবোধ লোপ হইয়া যায়। ফলে অতি সহজেই তাহার মনের সুস্থতা নষ্ট হওয়া সম্ভব। কল্পনা-বিলাসী ব্যক্তিদিগকে গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করিলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ভাবাবেগে পরিচালিত হওয়া বিপজ্জনক

মানুষের মনে অসংখ্য প্রকারের কামনা বাসনা উদিত হয় এবং তাহার অনেকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই জন্মে। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সভ্য সমাজে সহজাত প্রবৃত্তির সবকিছুই চরিতার্থ করা সম্ভব নহে এবং সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় যে কামনা বাসনা মনে জাগে তাহার মূল্যও বেশী নহে। যে দিকে মন যায় সে দিকেই ছুটিয়া যাওয়া মূর্খতার পরিচায়ক। যদৃচ্ছাক্রমে চলিলে সুখ নাই।

প্রত্যেকেরই শান্তচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কাজ করিলে তদ্দ্বারা তাহার জীবনের আদর্শ তথা সমাজের মঙ্গল কি পরিমাণে সাধিত হইবে। বাস্তবতার সঙ্গে জীবনধারাকে সংযোজিত করিতে হইবে। ভাবাবেগে চালিত হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ভাবাবেগে চালিত হইলে ব্যক্তিগত অথবা সমাজগত কোন মঙ্গল কার্য্যই কেহ সাধন করিতে পারে না।

বিবিধ মনোভাব

মানুষের মনে নানারূপ ভাবের উদয় হয়। কতকগুলি মনোভাব সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, কারণ সেগুলি সর্ব্বসময়েই অর্থহীন, নিস্প্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর, যেমন—

আত্মগ্লানি (হীনমন্যতা) অথবা নিজেকে অপরাধী মনে করা কিংবা নিজেকে ছোট করিয়া দেখা। এইরূপ মনোভাব মানসিক তেজ নস্ট করে, মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। শুধু তাহাই নহে, মানসিক স্বাস্থ্য সহজেই নস্ট করিয়া দেয়। হীনমন্যতা মানুষের মানসিক ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণরূপে অনেক সময় প্রকাশ পায়।

অনেক সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রে নারায়ণকে প্রণাম করা হয়—

"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরিকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥"

অর্থাৎ আমি পাপী, আমি পাপকর্ম্মকরী, আমি পাপাত্মা এবং পাপের ফলে আমার জন্ম—সর্ব্বপাপহর নারায়ণ আমাকে ত্রাণ কর।

যে ব্রাহ্মণ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাহার সাবিত্রী-দীক্ষা নিস্ফল হইয়াছে। গায়ত্রীপাঠ ও জপদ্বারা তাহার কোন উপকারই হয় নাই। অমৃতের পুত্র মানব কখনও পাপাত্মা বা পাপসম্ভব নহে। এইরূপ শ্লোক পাঠ করিলে বা পাঠ করাইলে অহেতুকভাবে হীনমন্যতা আনয়ন করা হইয়া থাকে। ইহার কোন সার্থকতা নাই।

উপাসনা বিষয়ে এরূপ বিধি কোথাও থাকা সমীচীন নহে যাহাতে উপাসক হীনমন্যতায় আক্রান্ত হইতে পারে।*

চৈতন্যচরিতামৃতে একটী সুন্দর কথা আছে—ভগবান বলিতেছেন,

"আমাকে ঈশ্বর বলে নিজে ভাবে হীন
তার প্রেমে বশ নহি নহি তার অধীন।"

সহজ কথায় বলিতে হয় যে, যদি মানুষ নিজেকে পাপী মনে করে তবে তাহার পাপাসক্ত হওয়া বিচিত্র নহে এবং পাপাসক্ত ব্যক্তির জীবনে সুখ নাই।

সংশয় অথবা সন্দেহ বায়ুগ্রস্ত হওয়া মানব জীবনের একটী অভিশাপ। ইহাদ্বারা নিজের বা অপর কাহারও কোন উপকারত হয়ই না, বরঞ্চ মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। যাহাদের বাস্তব জ্ঞান কম এবং যাহাদের কোন সমস্যার মীমাংসা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদেরই এইরূপ মনোবিকার হইয়া থাকে।

---

* মদীয় খুল্লতাত মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়কৃত হিন্দু দর্শন—৩য় খণ্ড (শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ প্রবন্ধ) হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

শাস্ত্রোক্ত উপাসনা বহু শাখায় বিস্তৃত হইলেও প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সম্পদ্ উপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও অহংগ্রহোপাসনা। তন্মধ্যে যে কোন এক ক্ষুদ্র বা অপকৃষ্ট বস্তুর অপকৃষ্টভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাকে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে উপাসনা, তাহার নাম সম্পদ্-উপাসনা। যেমন পার্থিব মূর্ত্তিবিশেষে পরমেশ্বরের উপাসনা। কোন একটী অংশবিশেষকে যে, অংশিরূপে বা পূর্ণ-বুদ্ধিতে উপাসনা,

অসূয়া (পরশ্রীকাতরতা) জীবনের শান্তি নষ্ট করে। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি নিজের কাজও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। মানুষ যে কোন অবস্থায় যে কোন বৃত্তি লইয়া থাকুক না কেন, তাহাতেই তাহার যশ ও উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু অপরের উপর দ্বেষ পোষণ করিলে নিজের ক্ষতিই হয়। এই মনোভাব নিষ্প্রয়োজনীয় এবং অতীব অনিষ্টকর।

প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা এবং প্রতিশোধ লওয়া উভয়ই ক্ষতিকর। আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে আঘাত করিলে, আঘাতই ফিরিয়া আসিবে—শান্তি পাওয়া যাইবে না। তিতিক্ষা (অপরাধ সহনশীলতা) অভ্যাস করিতে হয়। ভগবানে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস, শ্রীহরিকে যিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহার

তাহা প্রতীকোপাসনা। যেমন ব্রহ্মের অংশভূত মনে ও আদিত্যে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা। আর উপাস্য বিষয়ের সহিত উপাসকের যে, অভেদ-বুদ্ধিতে (অহংভাবে) উপাসনা, তাহার নাম অহংগ্রহোপাসনা। যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম ইত্যাকারে উপাসনা। এই তিনপ্রকার উপাসনাই সাধারণতঃ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে।

অহং-পদবাচ্য আত্মা রাগদ্বেষাদি দোষে দূষিত আর পরমত্মা ব্রহ্ম নিত্য নির্দ্দোষ পরম পবিত্র। এমত অবস্থায় অহংপদবাচ্য আত্মাকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করা কথনই সঙ্গত হইতে পারে না, এবং পরম পবিত্র পরমাত্মাকেও 'অহং'রূপে চিন্তা করা যায় না; কারণ তাহাতে ব্রহ্মের পবিত্রতার হানি করা হয়। এই কারণে আপাতদর্শনে ঐরূপ সংশয় হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে এরূপ সংশয় আসিতেই পারে না; কারণ, জীবাত্মাও প্রকৃতপক্ষে রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত নহে, পরন্তু নিত্যমুক্ত ও বিশুদ্ধ।

পক্ষে অপরাধ-সহনশীল হওয়া সহজ, অন্য লোকের পক্ষে কঠিন।*

অপর পক্ষে কতকগুলি মনোভাব আছে যেগুলি মাত্রামত কোন অপকার করে না, যেমন আনুগত্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, বান্ধবতা, সরলতা, বদান্যতা, দানশীলতা, উদারতা, ইত্যাদি। এই সকল চিত্তবৃত্তির বাহুল্য ভাল নহে। বিচার বিবেচনাদ্বারা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কতটুকু প্রয়োজন তাহা ঠিক করিয়া সেই হিসাবে কাজ করা সমীচীন। অবশ্য চিত্তবৃত্তিরোধ করা খুবই কঠিন এবং অনিপুণভাবে রোধ করিবার চেষ্টা করিলে কুফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাধারণতঃ চিত্তবৃত্তি রোধ করিবার জন্য গৃহী লোকের একটী সহজ উপায় হইল ঈশ্বরানুরক্তি। "যেন তেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—সকল প্রকার মানসিক অশান্তি, চিত্তচাঞ্চল্য তথা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ঈশ্বর-আশ্রয়ই একমাত্র সহজ উপায় এবং ইহা অমোঘ।

—0—

* তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ
শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি
তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি। শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৮।৪৮

নিন্দিত, বঞ্চিত, শাপগ্রস্ত, অবজ্ঞাত এবং তাড়িত হইয়াও ঈশ্বরানুরক্তগণ প্রতীকারের সামর্থ্য থাকিলেও তাহারা কিছুই করেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাগ্রতচেতন—সুপ্তচেতন—সংস্কার

মনোবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান মানসিক সুস্থতা রক্ষা করিতে যথেস্ট সহায়তা করে। কারণ, মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া মানসিক ক্রিয়া ও মনোবৃত্তি সমূহের উৎস বুঝিতে পারা যায়। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মনোবৃত্তিগুলির রহস্য জানিতে পারিলে অনেক অমূলক আশঙ্কা হইতে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। যদি কেহ মনোবিজ্ঞানের সহজ সূত্র কয়টী আয়ত্তে আনিতে পারে তবে তাহার চিন্তার স্বচ্ছতা আসে এবং নানারূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও মানসিক ব্যাধি হইতে ত্রাণ পাইতে পারে।

প্রথমতঃ **চেতনা** বা চৈতন্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে দুইটী প্রশ্ন আমাদের মনে আসে।—

২। চেতনা বলিতে কি বুঝা যায় ?

১। চেতনা দ্বারা মানুষ কিরূপে সমগ্রভাবে এই বিশ্বসংসারকে গ্রহণ করিতে পারে ?

যাবতীয় ইন্দ্রিয়ই * চেতনার অভাবে কর্ম্মক্ষমতাহীন। যে শক্তি

---

* ইন্দ্রিয় তিন প্রকার—

১। কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

২। জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

৩। অন্তরেন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

দ্বারা মানুষের সমুদয় ব্যবহার ও কার্য্যের ব্যাখ্যা করা যায় তাহাকে চেতনা বা চৈতন্য নাম দেওয়া হইয়া থাকে। চৈতন্যকে একটী 'ভাড়ার' ঘরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—যেখানে মানব জীবনের যাবতীয় উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা জন্মাবধি সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহা হইলে এই কথাই বলা যায় যে, অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির রূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও ধ্বংস হয় না। এই চৈতন্যকে একটী গভীর সমুদ্রের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে যাহার গভীরতা বা সীমানা বর্ণনা করা যায় না। এই চৈতন্যরূপ সমুদ্রে জীবনের সমগ্র অনুভূতি আসিয়া সঞ্চিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ নদীসকলদ্বারা অনুভূতিগুলি আসিয়া থাকে এবং নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঞ্চিত হয়। সমগ্র অনুভূতি মিলিয়া ধারণার সৃষ্টি করে এবং সকল প্রকার ধারণা একত্রিত হইয়া জীবন-ধারা রচিত হয়। অনুভূতিগুলি যখন চেতনাতে সঞ্চিত হয় তখন তাহাদের সাদৃশ্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং যখন যে ঘটনা সংঘটিত হয় সেই ঘটনার কালও অনুভূতির সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রত্যেকের **প্রকাশ চেতনার** অন্তরালে এক গভীর **অপ্রকাশ চেতনা** বিরাজমান রহিয়াছে। প্রকাশ ও অপ্রকাশ চেতনা কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। কোন বিষয়ে যখন মনঃসংযোগ হয় তখন কেবল সেই বিষয়টীই সর্ব্বাগ্রে চেতনাকে আশ্রয় করে, যদিও অন্যান্য বিষয় আংশিকরূপে আসিতে

পারে। মন এক সময়ে একটীমাত্র বিষয় গ্রহণ করিতে পারে—অন্যান্য বিষয় সে সময় চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু এরূপ তড়িৎ-গতিতে মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে পারে যে, মনে হয় যেন একসময়েই কতকগুলি বিষয়ে মনঃসংযোগ হইয়াছে।

যে বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় সেই বিষয়টী মুখ্য বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু মন একসময়ে একটীমাত্র বিষয়ে আবদ্ধ হইতে পারে, সেই হেতু কোন বিষয়ে যদি তীব্র মনঃসংযোগ করা যায় তবে অন্যান্য বিষয় হইতে সেই বিষয়টী মুখ্য হইয়া দাঁড়াইবার ফলে অন্য সকল অনুভূতি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এইরূপে একটীমাত্র অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়া মানুষ অপর সকল অনুভূতি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যায়। ফলে তাহার চিত্তে সঙ্কীর্ণতা আসে এবং অধিক দিন এই-ভাবে চলিলে মনের সুস্থতা নস্ট হইতে পারে।

চেতনার যে অংশের উপর মনঃসংযোগ করা হয় তাহকে বলা হয় **সচেতন জ্ঞান** (প্রকাশ চেতন বা জাগ্রত চেতন), আর যে অংশ তখন মনের বাহিরে থাকে তাহাকে বলা হয় **সুপ্ত চেতন** (অপ্রকাশ চেতন)। যে জ্ঞান একসময়ে সচেতন থাকে তাহাই অন্য সময়ে সুপ্ত চেতনে যাইতে পারে। এই উভয় প্রকার চেতনা মানুষের জীবনকে চালিত করিয়া থাকে। মানুষ সচেতনভাবে কাজ করে, কিন্তু অপ্রকাশ চেতনাও (সংস্কারে রূপান্তরিত) তাহার জীবনের বহু কাজ, চিন্তা ও মনোভাব নিয়ন্ত্রিত করে।

সহজাত বৃত্তি

সহজাতবৃত্তিগুলির মানব জীবনের উপর প্রভাব খুব বেশী এবং জীবনকে চালিত করিতে ইহাদের ক্ষমতাও যথেষ্ট। চেতনার উপরেও সহজাত বৃত্তিগুলির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়।

কোন বিশেষ উদ্দীপক বস্তুর সান্নিধ্য পাইলে একটী পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টরূপে ক্রিয়া করিবার যে জন্মগত প্রবণতা, তাহাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয়। এই যে জন্মগতপ্রবণতা তাহা সমগ্র জীবজগৎ তথা মানব জাতির মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং কোন ব্যক্তিবিশেষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

সহজাত প্রবৃত্তি মানবের কর্ম্ম জীবনে শক্তির উৎস। সহজাত প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে তিনটী অংশ আছে বুঝিতে পারা যায়।—

১। উদ্দীপক বস্তু বা ক্রিয়া যাহার সান্নিধ্যে উদ্দীপনা আরম্ভ হয়;

২। যাহার ফলে মনে ভাবাবেগ আসে;

৩। তৎপর সেই ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ।

বিভিন্ন ব্যক্তির মনে একই বস্তুদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবেগের সঞ্চার হইতে পারে, যথা—

"অতো মাংসময়ী যোষিৎ
কাচিদন্যা মনোময়ী।

মাংসময্যা অভেদোঽপি
ভিদ্যতেঽত্র মনোময়ী ॥" ভক্তিরসায়ন ২৫।

যে হেতু মানসিক সংকল্পভেদে একই বস্তু নানারূপে দৃষ্ট হইতে পারে, সেই হেতু বলিতে হইবে যে, মাংসময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি একটী বস্তু আর মনোময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অপর একটী পৃথক বস্তু। মাংসময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি সকলের নিকট সমান হইলেও মনোময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বিভিন্ন অর্থাৎ একই মাংসময়ী মূর্ত্তি বিভিন্ন লোকের বাসনা বা মনোভাব অনুসারে বিভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে একটী সুন্দর উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করা হইল। গজেন্দ্র বধ করিয়া রাম-কৃষ্ণের মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি নিজেদের মনোভাব বশতঃ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেখিতে লাগিল—

"মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩।১৭।

অর্থাৎ অগ্রজের সহিত রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জনসমূহের নিকট বিভিন্নরূপে প্রকাশমান হইলেন। যেমন—মল্লদিগের অন্তঃকরণ দ্বেষদুষ্ট বলিয়া তাহাদের নিকট তাঁহার স্বভাব-সুকুমার অঙ্গ বজ্রকঠিন বোধ হইল; অপরাপর মথুরাবাসীদিগের চিত্তে দ্বেষাদিভাব না থাকায় তাহাদের নিকট তিনি রূপগুণাদিতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিভাত হইলেন; জনন্যাদি ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় প্রেমরসে অভিসিঞ্চিত থাকায় তাহাদের নিকট তিনি সাক্ষাৎ মন্মথরূপে প্রতীয়মান হইলেন; সখ্যরসের অবস্থিতি হেতু গোপগণ তাঁহাকে স্বজন মনে করিল; অসৎ নৃপতিগণের চিত্তে ক্রোধ থাকায় তাহারা তাঁহাকে শাসকরূপে দেখিল; বাৎসল্যরস বশতঃ নন্দ-বসুদেব অথবা বসুদেব-দেবকী তাঁহাকে শিশুরূপে দেখিলেন; ভয়ার্ত্ত ভোজরাজ কংস সর্ব্ব-জীবসুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ মনে করিলেন; ভগবানের লীলামাধুর্য্য বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় কংসের পুরোহিতাদি জনগণ তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্যরূপে বুঝিল; শান্তরসের প্রভাব বশতঃ সনকাদি যোগিগণ তাঁহাকে পরম ব্রহ্মরূপে দেখিলেন; এবং দাস্যরসের অধীন হইয়া বৃষ্ণিগণ তাঁহাকে উপাস্য পরমেশ্বর মনে করিল।

মনে কোন বিশেষ ভাব কেন উদিত হইল তাহা লইয়া বিব্রত হইবার হেতু নাই, কিন্তু **ভাবাবেগে** চালিত হইয়া কিরূপ কাজ করা হইল তাহাই বিচার্য্য বিষয়। মনে কোন ভাবের আবেগ

আসিলে সেই ভাবাবেগে চালিত হইয়া যে কাজ করা হইল তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষ নিশ্চয়ই দায়ী, কিন্তু সেই মনোভাবের জন্য সে কোনক্রমেই দায়ী নহে। অতএব সহজাত মনোবৃত্তি সকল যদিও জীবনের নানা কর্ম্মে শক্তি দান করে, তথাপি অন্যান্য শক্তির মতই ইহাকে বুঝিতে হইবে, নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং সুনির্দ্দিষ্টভাবে চালিত করিতে হইবে। নতুবা অর্ব্বাচীনের মত যে কোন প্রকার মনোবৃত্তিকে চরিতার্থ হইতে দিলে ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজের নানারূপ ক্ষতি হইবে।

অনেক সময় ভাবাবেগে ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া মানুষ নিজের ও অপরের মহা অনিষ্ট সাধন করে এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে। কেবলমাত্র তাহাই নহে, সে মনের স্বস্থতা হারাইয়া ফেলিয়া নানারূপ অশান্তিতে ভুগিয়া থাকে এবং ক্রমে মানসিক শক্তি হারাইয়া মানসিক ব্যাধিগ্রস্তও হইতে পারে। ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া কত শক্তির যে অপচয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি যদি কোন পরিবারের কর্ত্তা হয় অথবা কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়, তবে সে পরিবার বা রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, ভাবাবেগে ভ্রান্ত পথে চালিত লোক নিজের এবং সমাজের কতই না অনিষ্ট করিয়াছে।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে অনেক প্রকার **ভাববিলাস** পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনেক ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে;

সমাজে বাস করিতে হইলে স্বেচ্ছামত কার্য্য করা সম্ভব নহে এবং বিধেয়ও নহে। অতএব কোন ব্যক্তিকে সুস্থ মনে সমাজে বাস করিতে হইলে তাহাকে বুদ্ধিদ্বারা এবং আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে। সত্য বটে, ভাবাবেগ খুব শক্তিশালী, কিন্তু ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, মনে নানাভাবের উদয় হইবেই—ইহা সহজাত, কিন্তু বুদ্ধিবিবেচনা সহকারে অবাঞ্ছিত ভাবসকল দমন করিতেই হইবে। কেন মনে কোন বিশেষ ভাব আসিল তাহা লইয়া মাথা ঘামান উচিত নহে।

মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে। ইহা একাধারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইহাদ্বারা অনুভব করা যায় এবং মনন করা যায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় কেবল বর্ত্তমান বিষয়কে গোচরে আনিতে পারে, মন কিন্তু অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়কে গোচরে আনিতে সমর্থ হয়, এবং ঐ সকল বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে। মনঃসংযোগ সময়ে মাত্র একটী বিষয়ই মনের গোচরে আসে এবং অন্যান্য বিষয় সুপ্ত চেতনায় অবস্থান করে।

যখন কোন বিষয় মনের গোচরে আসে, তখন তাহা স্মৃতির কাজ এবং তখন অন্যান্য বিষয় মনের অগোচরে **সংস্কাররূপে** বিদ্যমান থাকে। সংস্কার মানবের জীবনধারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

মনের অসংখ্য কামনা পূরণ হইবার নহে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান

সভ্য সমাজে। এজন্য অনেক প্রকার কামনা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। মন যাহা চাহে বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অভিপ্রেত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ অনেক সময় অনভিপ্রেত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া জীবনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করিয়া থাকে। এই অতৃপ্ত কামনার ফলে উদ্ভব হয় **"অন্তর্দ্বন্দ্ব"**।

সহজাত প্রবৃত্তি এবং জ্ঞান বুদ্ধির প্রভেদ অথবা আদর্শের প্রভেদ মানুষের অন্তর্বিক্ষেপ বৃদ্ধি করে। এবং তাহার ফলে নানারূপ মানসিক দুর্ব্বলতা, এমন কি মানসিক ব্যাধি পর্য্যন্ত আসিতে পারে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মানুষের জীবনে অহরহঃ ঘটিয়া থাকে, ইহা মানব জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

বহু লোক এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন সুমীমাংসা করিতে সক্ষম হয় না, আবার অনেকে ইচ্ছা করিয়া ইহার মীমাংসা করে না, ভাবে কালে সকল ঠিক হইয়া যাইবে। যখন এই দ্বন্দ্ব কাহারও অপ্রকাশ চেতনায় (সংস্কারে) দানা বাঁধে, তখন সেই ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতরূপে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, এবং প্রায়শঃ মানসিক চাঞ্চল্যে ভুগিয়া থাকে, যাহার ফলে সে সহজেই উত্তেজিত হয়। কারণ, সুপ্ত চেতন (অপ্রকাশ চেতন) এরূপ অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব পছন্দ করে না, সেখানে একপ্রকার বুঝাপড়া হয়, এবং সেই বুঝাপড়া এমনভাবেই হয় যে, তাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটিতে পারে।

অতএব যখনই কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটিবার কারণ উপস্থিত হইবে

তখনই উহার মীমাংসা করা একান্ত প্রয়োজন। **চেতন জ্ঞানে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে**, এবং যে পথই স্থির করা হউক উহার ভাল মন্দ লইয়া সেই পথকে পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই দ্বন্দ্বকে কখনও অমীমাংসিত রাখিয়া সুপ্ত চেতনকে তোলপাড় করান সঙ্গত নহে। মানসিক সুস্থতা বজায় রাখিতে হইলে মধ্য পথ চলিবে না, যাহা কিছু মীমাংসার তাহা সুখের হউক বা দুঃখের হউক সচেতন জ্ঞানেই নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

সহজাত প্রবৃত্তি নিরোধ করিলে অনিষ্ট হয় এরূপ ধারণা অনেকের আছে। তাহাদের ধারণা—"মন যাহা চাহে করিয়া লও, দু'দিনের এই সংসার।" কিন্তু এরূপ ধারণা মঙ্গলপ্রদ নহে।

প্রত্যহ প্রত্যেককেই চিত্তবৃত্তি কিছু পরিমাণে নিরোধ করিতে হইবে। যদি বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা করা হয় এবং প্রবৃত্তি নিরোধ কার্য্যটী অসহনীয় না হয় তাহা হইলে ইহা কোন ক্ষতি করিবে না। মানুষ একটু অভ্যাস করিলে অনেক কিছুই সহ্য করিতে পারে। সত্য কথা বলিতে কি, সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া নিরোধ এবং সেই নিরোধের জন্য যে যন্ত্রণাভোগ, এই দুই মিলিয়া মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি করে। প্রবৃত্তির দমনই মানসিক ব্যাধির কারণ নহে; ভদ্রভাবে সমাজে বাস করিতে হইলে বহু প্রবৃত্তিই দমন করিতে হইবে। সকলেরই ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যখন মনে কোন প্রবৃত্তির উদয় হইবে তখন দেখিতে হইবে,

তাহা চরিতার্থ করিলে কি বাঞ্ছিত ফললাভ হইবে এবং চরিতার্থ না করিলেই বা কি ক্ষতি হইবে। সুখ সুখ করিয়া যাহা মনে আসে তাহা করিলেই বিপদ এবং লিপ্সা পূরণ না হইলে বিষাদগ্রস্ত হওয়া অধিকতর বিপজ্জনক। সংযমে কোন কুফলের আশঙ্কা নাই, কিন্তু অসহিষ্ণুতাই যত অনিষ্টের মূল।

সুখদুঃখের ভাবনা অবচেতন মনের ক্রিয়া বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। যে কোন ঘটনা হউক, তাহা হয় সন্তোষজনক (প্রেয়) নতুবা অসন্তোষজনক (হেয়), আনন্দকর অথবা দুঃখকর। এই সুখদুঃখ বোধের সহিত ঘটনাগুলি কালক্রমে সুপ্ত চেতনে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সেখান হইতে মানবের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে।

মানুষের স্বভাব এই যে, যাহা কিছু দুঃখজনক তাহা সে পরিহার করে এবং যাহা কিছু সুখজনক তাহা সে অনুসরণ করে। শিশুদের এই প্রবৃত্তি অতি প্রবল, কিন্তু বয়স্ক লোকের পক্ষেও এই প্রবৃত্তি সমভাবে ক্রিয়া করে। প্রত্যেক কার্য্যে সুখ-দুঃখের বিচার করিলে এই সংসারে নানারূপ পরিবেশের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান কঠিন। প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্বশীল ব্যক্তির ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন কিছু দুঃখজনক হইলেই তাহা হইতে দূরে থাকা এবং কোন কিছু সুখজনক হইলেই তাহাতে আসক্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। একটী বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে যে, দুঃখকে যে যত ভয় করিবে দুঃখ তাহাকে

ততই পাইয়া বসিবে, অর্থাৎ দুঃখকে এড়াইবার জন্য যে চেষ্টা তাহাতে অধিকতর দুঃখ পাইবারই সম্ভাবনা। সেইরূপ যে যত সুখের পিছনে ছুটিবে সুখ তাহার নিকট হইতে তত দূরে চলিয়া যাইবে। মানুষের সুখ-দুঃখবোধ থাকিবেই, তথাপি যখন যে কার্য্যটী সে করিতেছে তখন সেই কার্য্যটীকেই তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে; ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইলে তাহার পক্ষে অনেক কার্য্য করা সম্ভব হইবে না।

আপাততঃ দুঃখদায়ক কার্য্য পরিণামে ব্যক্তিবিশেষের তথা সমাজের মঙ্গলদায়ক হইতে পারে, এবং আপাততঃ সুখদায়ক কার্য্য তাহার নিজের ও দশের মহা অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে উপরের কথাগুলি সকল সময় স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মাপকাঠিতে কোন কার্য্য বিচার করিলে কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। হেয়-উপাদেয় বোধ রহিত হওয়া সকল সময় সম্ভব নহে, তথাপি উহা লইয়া সকল সময় মাথা ঘামাইলেও লাভ নাই। যে কার্য্যটী করা হইল বা করা হইবে সমগ্রভাবে তাহার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ই বিচার করিতে হইবে—ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সকল সময় বিবেচনা করিলে চলিবে না।

মানুষ জীবনে নানা ঘটনা ও নানাপ্রকার লোকের সংশ্রবে আসিয়া থাকে। কখনও সে সেই সকল ঘটনার সহিত নিজে জড়িত হয়, আবার কখনও বা দর্শক মাত্র থাকে—সেই সকল ঘটনা

প্রত্যক্ষভাবে তাহার ভালমন্দ করিতে পারে না। অবশ্য মানুষ সামাজিক জীব; সমাজের যে কোন লোকের কার্য্যের ফলাফল তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিতে না হইলেও ভবিষ্যতে তাহার ভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকে। দৈনন্দিন জীবনে সে যে সকল লোকের সংশ্রবে আসে তাহাদের কতক বন্ধুভাবাপন্ন, কতক বা উদাসীন এবং কতক শত্রুভাবাপন্ন—যাহাদের দ্বারা তাহার অনিষ্ট হইয়াছে বা হইতে পারে বলিয়া সে মনে করে। এই সকল ঘটনা ও লোক সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সঠিকরূপে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য এবং প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ তাহার এই অভিজ্ঞতা সচেতন মনে থাকিতে পারে অথবা হয়ত শীঘ্রই সুপ্ত চেতনাতে চলিয়া যাইতে পারে। যদি সে প্রকৃতভাবে ঘটনাটী গ্রহণ করিতে না পারে তবে তাহার ফল শুভ হইবে না।

মানুষের স্বভাব এই যে, সে সচরাচর ঘটনাগুলিকে হয় খুব বড় করিয়া দেখে, নহেত খুব ছোট করিয়া দেখে। যদি কোন ঘটনা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে তবে সাধারণতঃ তাহাকে খুব বড় করিয়াই দেখিয়া থাকে। এমনও হয় যে, কোন ঘটনাকে সে ভুলক্রমে দুঃখের মনে করিয়া চেতনাতে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং কালে সেই দুঃখানুভূতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে এমন কাণ্ড করিয়া বসে যাহা কখনও তাহার করার প্রয়োজন হইত না। যদি সে ঠিকভাবে বিচার করিয়া ঘটনাটীকে গ্রহণ করিতে পারিত তাহা হইলে ঐ প্রকার বিসদৃশ কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইত না।

তুচ্ছ একটী ঘটনাকে যদি কোন লোক ভঙ্কর মনে করে এবং সেইভাবেই উহাকে গ্রহণ করে, তবে সেই ভাবনা তাহার চেতনায় প্রবেশ করিয়া, কালক্রমে স্মরণে না থাকিয়া সুপ্ত চেতনায় সঞ্চিত হইলেও সেই কল্পিত ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে অস্বাভাবিক যে কোনপ্রকার কাজ করিতে পারে। হয়ত বাহির হইতে তাহাকে স্বাভাবিক প্রকৃতির বলিয়াই মনে হইবে, কারণ তাহার সচেতন মন স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে চাহে। অতএব যে কোন ঘটনাকে তাহা সংঘটিত হইবার সময়েই ভালমন্দ যাহাই হউক, প্রকৃতভাবে স্থির করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এবং সেই ঘটনার সহিত ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ভাবনা যতটা সম্ভব বর্জ্জন করা সঙ্গত। কারণ, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ভাবনা ঘটনাটীকে বিকৃত করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়, এবং তাহাই সচরাচর লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় ঘটনার বিকৃত রূপ মানুষকে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় প্ররোচিত করে এবং মনোবিকার ঘটাইয়া থাকে। এখানে একটী কথা স্মরণ রাখিলে বিশেষ উপকার হইবে যে, "পৃথিবীতে যে কোন লোক বা যে কোন ঘটনা জীবনে আমাদের সংশ্রবে আসে, তাহা বিশ্ববিধাতার নির্দ্দেশেই আসিয়া থাকে এবং তাহা সমষ্টিগত ভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্যই আসে।"

সকল সময়ে উপরের কথাটী মনে রাখা সহজ নহে—ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি থাকিলেই তাহা সম্ভব। ঈশ্বর করুণাময় ইহা মনে রাখিতে পারিলে মানুষ অনেক দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইতে

পারে। ঈশ্বর শব্দের অর্থই হইল সর্ব্বনিয়ন্তা। ভগবানের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলে কোন ঘটনা মানুষকে বিচলিত করিতে পারিবে না। সুখদুঃখের চিন্তাই মহা অনিষ্টকর। *

---

* চিন্তানলে সজীব দেহ দগ্ধ হইয়া থাকে এবং তাহা প্রাণী মাত্রেরই অসহনীয়। আর চিতানলে প্রাণহীন দেহ দাহ করা হয়। সেইজন্য চিতা ও চিন্তার মধ্যে চিন্তাই অধিকতর দুঃখদায়ক।

"চিন্তাচিতা বিন্দুমতী
চিন্তাতো দশধাধিকা।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং
সজীবো দহ্যতেঽনয়া।" প্রাচীন বচন

অর্থাৎ যেমন কোন সংখ্যায় বিন্দু সংযোগ করিলে তাহা দশগুণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 'চিতা' শব্দে বিন্দু সংযোগ করিলে তাহা চিন্তারূপে চিতাপেক্ষা দশগুণ ক্লেশ-দায়ক হইয়া থাকে। যে হেতু চিতানলে প্রাণহীন দেহ দগ্ধ হয়, :কিন্তু চিন্তানলে সজীব দেহ দগ্ধ হয়, সেই যেতু চিন্তাক্লিষ্ট জীবের মরণাধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে বিবেচনা ও বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষের অসুবিধা এই যে, তাহার মনোবৃত্তি শিশু-কালে বহুল পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। সেই কারণে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও, যদিও সে ঘটনাটীর প্রকৃত রূপ আংশিক পরিমাণে বুঝিতে পারে, তথাপি সংস্কারবশে প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়। শিশুকালে অর্জ্জিত তাহার সংস্কার তাহার বিবেচনাশক্তি ম্লান করিয়া দেয়।

শিশুরা সহজেই উত্তেজিত হয়। বয়স্ক লোকেরা পরিপক্ব বুদ্ধিদ্বারা যে কোন ঘটনা বিচার করিতে পারে এবং সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু শিশুরা অপরিপক্ব বুদ্ধিদ্বারা কোন কিছুর ভালমন্দ সহজে বুঝিতে পারে না। শিশুকালে যেরূপ কার্য্যদ্বারা শিশুর ভাবাবেগ প্রশমিত হয়, বয়স হইলেও কেহ কেহ তাহা সংশোধন করিতে পারে না। ইহার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও তাহাকে প্রবৃত্তির দাস হইতে হয়। তাই দেখা যায় যে, শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকও অনেক সময় এমন শিশুসুলভ অস্বাভাবিক কাজ করিয়া বসে যে, তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর লোকের সব কিছু নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখা সমীচীন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রবৃত্তি ও আদর্শের সংঘাতে মানুষ যদি ঠিক পথ নির্ণয় করিতে না পারে তবে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, এবং তাহা সুপ্ত চেতনায় সঞ্চিত হইলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইহার ফলে মানুষ প্রায়শঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভুগিয়া থাকে এবং মানসিক অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেরূপ অসুস্থ অবস্থায় তাহার প্রবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হয়।

মনকে সুস্থ রাখিবার উপায় সকল জানা থাকিলে—বিশেষতঃ জাগ্রত চেতন ও সুপ্ত চেতন অবস্থার রহস্য বুঝিতে পারিলে, সহজাত প্রবৃত্তি ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে, সহজে কোন সমস্যার সুমীমাংসা করিতে পারিলে, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

মনকে সুস্থ রাখিতে হইলে বুদ্ধির ব্যবহার এবং জীবনের আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহা পরিষ্কাররূপে জানা কর্ত্তব্য। সহজাত প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হওয়া পদে পদে বিপজ্জনক। বুদ্ধি বিবেচনার সহিত চলিলে অনায়াসে সন্তোষজনকভাবে অনেক বিষয় মীমাংসা করিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করা যায়। ভাবাবেগে চালিত হওয়া কিছুই কঠিন নহে, কিন্তু ফল সাধারণতঃ খুবই খারাপ হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করা আয়াসসাধ্য। জীবনে সকল সময় এবং সকল ব্যাপারে যত্নপূর্ব্বক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া চলিতে পারিলে ভাবাবেগ রোধ করা সম্ভব হয়। মানুষ যতই বুদ্ধি

বিবেচনাদ্বারা চালিত হইবে ততই সে কামনা বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ জীবনধারা উপভোগ করিতে পারিবে। সংযমই সন্তোষের মূল।

কামনা বাসনা হইতে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নহে যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন মঠে বা আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে হইবে। গার্হস্থ্য আশ্রমই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, কারণ গৃহে অবস্থান করিয়াই মানুষ সংযতভাবে তাহার যাবতীয় করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণদ্বারাই যে শান্তি লাভ করা যাইবে তাহা নহে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, কোন কোন মঠের বা আশ্রমের অধিবাসী গৃহী হইতেও অধিকতর মাত্রায় বিষয়াসক্ত ও আত্মসচেতন।

জ্ঞান থাকিলেই যে বুদ্ধি থাকিবে এমন কোন কথা নাই। জানার সাধারণ নাম জ্ঞান। কোন বিষয় কেবল মাত্র জানিলেই লাভ হইবে না; সামাজিক কল্যাণবোধ বর্জ্জিত জ্ঞানে মানুষ কখনও তৃপ্তি পাইবে না। যে জ্ঞানদ্বারা সমাজস্থ সকলের সাহায্য করিতে না পারা যায়, সেরূপ শুষ্ক জ্ঞান লাভ করিয়া কোন উপকার হইবে না।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, যাঁহারা বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও সহজাত কামপ্রবৃত্তি নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কন্যাতুল্যা স্বীয় ছাত্রীকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া বসেন। অতএব

কোন বিষয় কেবল জানিলেই হইবে না, সমাজের হিতের জন্য তথা আত্মহিতের জন্য সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করিতে হইবে। ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞানও নিরর্থক হইবে যদি সেই জ্ঞানের ফলে ঈশ্বরানুরক্তি না জন্মে।

ধ্যানলব্ধ সত্য জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাবান লোক সুখে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বুদ্ধি থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধি হঠাৎ প্রকাশ পায়; কাহারও বা প্রয়োজনকালে বুদ্ধির উদয় হয় না। বুদ্ধিমানের উপায় জ্ঞান থাকে।

বুদ্ধি প্রয়োগ করার সার্থকতা হইল কামনাকে সংযত করা। নিত্য ও অনিত্য জ্ঞানদ্বারা মানুষ কামনাকে জয় করিতে পারে। দুঃখের সহিত কামনা নিরোধ বিপজ্জনক, কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক কামনার বিষয়কে তুচ্ছ বোধ করিতে পারিলে সেই কামনা রোধ আর দুঃখের হেতু হইতে পারে না। বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা চালিত লোক সহজেই পরিবেশের সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। **বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা চলিবার অভ্যাস না করিলে হঠাৎ কোন প্রয়োজনের সময় বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।** যাহারা প্রতিটী কার্য্য বুদ্ধি বিবেচনার সহিত করে তাহারাই কেবল সকল সময় ইহা প্রয়োগ করিতে পারে, অন্যের পক্ষে ইহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। বাল্যকাল হইতেই এরূপ শিক্ষা পাওয়া

প্রয়োজন। শিশুকে এরূপভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে সে যে কোন বিষয়ে—

১। সহজভাবে চিন্তা করিতে পারে;

২। ঘটনাগুলিকে নিজের মনোভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার ক্ষমতা লাভ করে; এবং

৩। বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে—সেই অবস্থা তাহার অভিপ্রেত হউক বা না হউক।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বিবেচনা করিবার ক্ষমতার উপরই তাহার জীবনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। বিবেচনা করিয়া না চলিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ইহা মনে রাখিয়া প্রতিটী কাজ যাহাতে বিবেচনা পূর্ব্বক করা হয় সেই অভ্যাস শিশু-কাল হইতেই করিতে হইবে এবং বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। নিজের কতটা বুদ্ধি আছে তাহা লইয়া মাথা না ঘামাইয়া প্রতি কাজে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা জীবনের একটী সাধনা স্বরূপ।

যাহারা অন্যায় কাজ করে এবং তাহার ফলে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে তাহারা যে, সকল সময় বুদ্ধিহীন তাহা নহে। শুধু দোষ এই যে, তাহারা সুবিবেচনার সহিত কাজ করিতে চাহে না। ইহা অবশ্য ঠিক যে, মানুষের অনেক ব্যবহারই বুদ্ধিদ্বারা চালিত হয় না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি (মনোবৃত্তি) খুবই বলবান,

ইন্দ্রিয়সুখের প্রেরণায় বুদ্ধিবিবেচনায় জলাঞ্জলি দিতে সে একটুও কার্পণ্য করে না।

"বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৭

অর্থাৎ বলবান ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া কুকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে।

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিষয়-বাসনা নিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতও মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়াছে ও দিতেছে—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ॥" ৯।১৯।১৬

অর্থাৎ জরাজীর্ণ ব্যক্তিও যাহা ত্যাগ করিতে পারে না, দুর্ম্মতি ব্যক্তি যাহা দুঃখের সহিত ত্যাগ করিতে পারে, মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি সেই নানা ক্লেশের হেতু বিষয়-বাসনা শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে।

সচরাচর দেখা যায় যে, যাহারা কামনার দাস তাহারাই অধিকাংশ সময় মানসিক চঞ্চলতা, খাপছাড়া আচরণ, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতিতে ভুগিয়া থাকে। কোন অপকর্ম্মকে বুদ্ধির দ্বারা সমর্থন করা বিশেষ বিপজ্জনক। আত্মবঞ্চনা না করিয়া ঘটনা-গুলিকে বাস্তবতার সহিত বিচার করিতে হইবে, নতুবা নানারূপ ক্লেশ ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

আদর্শচ্যুত ব্যক্তির বুদ্ধি কুপথে চালিত হইবে এবং সেই কুবুদ্ধিই তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইবে। মহৎ আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তির বুদ্ধি সুপথে চালিত হইবে এবং তাহাই তাহাকে শান্তির পথে লইয়া যাইবে। মানুষের **জীবনাদর্শ** যেন প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। সত্য বটে, দেশ-কালভেদে ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে, তথাপি কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মঙ্গলময় জীবনধারার অধিকারী করে। প্রত্যেকের ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে বিশ্ব-সংসারের একটী অংশমাত্র, তাহার নিজের অস্তিত্ব অপর লোক ও বিষয়-নিরপেক্ষ নহে। ভগবান কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহুতিকে বলিতেছেন—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু
ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ
কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু
সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্
ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং
মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য
ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।২১-২৩

অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন, "সর্ব্ব জীবে আমি আছি; সর্ব্বজীবে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া শুধুমাত্র প্রতিমাতে আমার পূজা করা একপ্রকার বঞ্চনামাত্র। পর শরীরে অবস্থিত আমাকে যে দ্বেষ করে এবং অপরের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে সে কখনও শান্তিলাভ করে না।"

জীবনের এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে যে কোন ব্যক্তির দ্বারা সমাজের তথা সমগ্র মানব গোষ্ঠীর যেন মঙ্গল সাধিত হয়। এইরূপ আদর্শে বিশ্বাসী লোকের সুবুদ্ধি ক্রিয়া করিবে। যাহারা অপকর্ম্ম করে তাহারাও বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া কৌশল পূর্ব্বক তাহা করিয়া থাকে; কিন্তু অপকর্ম্মের ফল কখনও শুভ হইতে পারে না।

ভাবাবেগে চালিত হইয়া যখন কোন লোক কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার বুদ্ধি ম্লান হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কিরূপে কাজ করা কর্ত্তব্য তাহা জানে, কিন্তু তাহার ভাবাবেগ এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় এবং জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া ভাবাবেগেই চালিত হয়। বস্তুতঃ সচরাচর এরূপ দেখা যায় যে, বিবেক-বিবেচনা ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যেখানে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সেখানে সহজাত প্রবৃত্তির

দিকেই লোক ঝুকিয়া থাকে—বিশেষতঃ যে সকল লোকের কোন উচ্চাদর্শের ধারণা নাই। আদর্শচ্যুত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিও এরূপ অবস্থায় বিমূঢ় হইয়া পড়ে। এইরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে উচ্চাদর্শের ভাবে ভাবিত হইয়া সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে মঙ্গল হয়। উপরে যে আদর্শের কথা বলা হইল তাহা স্বীকার করিয়া লইলে এই সংসারে সহজেই নিজেকে পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়ান যাইতে পারে।

যখনই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তখনই দেখা কর্ত্তব্য যে, সেই কার্য্যদ্বারা সমগ্রভাবে মানব সমাজের কি ইষ্ট সাধিত হইবে। ইহা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, মানব সমাজের ইস্টকর কার্য্য করিলে কর্ম্মকর্ত্তার নিজেরও মঙ্গল হইবে, কারণ সে সমাজেরই অংশ বিশেষ। সচ্চিন্তা মানুষকে অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে পরিত্রাণ দেয় এবং মানসিক সুস্থতা রক্ষা করে। উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাই মঙ্গলপ্রদ।

দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ লোকেরই জীবনে কোন সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই অথবা সুনির্দ্দিষ্টভাবে কার্য্য করিবার আগ্রহও নাই। ইহার ফলেই যত গোলযোগের সৃষ্টি। যে সকল ভাবাবেগ অনিষ্টকর তাহা দমন করিতে মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন, এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখিতে হইলে সচ্চিন্তা, ঈশ্বর-শরণ ও সু-আদর্শ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য সাধন

পরিবেশের সহিত ভালরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে মানসিক সুস্থতা নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সচ্চিন্তা ও সু-আদর্শে চালিত হওয়া মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরও ব্যক্তিবিশেষের পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা বহুলাংশে নির্ভর করে। বিষয়গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—

১। কায়িক অবস্থা,
১। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং
৩। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বুদ্ধিদ্বারা চালিত জীবন সুখের হইয়া থাকে। ধীশক্তি বা বুদ্ধি মানবের যত কিছু গুণ আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। মানুষ যে পরিমাণ বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিপক্ক হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—যদিও তাহা সু অথবা কুপথে চালিত হওয়া সম্ভব। বহু-প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ

১৬ হইতে ১৮ বৎসরের পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য মস্তিষ্কের গুরুতর পীড়া হইলে অথবা মস্তিষ্কে আঘাত পাইলে বুদ্ধির হ্রাস হওয়া সম্ভব এবং তাহার ফলে মানসিক অপকৃষ্টতা আসিতে পারে।

সাধারণতঃ মানুষ তাহার সকল কাজে বুদ্ধির পূর্ণ ব্যবহার করে না। মানসিক সুস্থতা রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে সুবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সকল কাজ করা হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করিয়া বিচার করিবার শক্তি লাভ করে, কিন্তু বুদ্ধিমানমাত্রেই যে বিচারক্ষমতা সম্পন্ন হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক লোক জন্মাবধি বিচারশক্তিহীন, ফলে তাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হয়। তাহাদের অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্যদ্বারা নিজেরা পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া নানাবিধ অশান্তি ভোগ করে। সে অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সহজেই নষ্ট হইতে পারে। যদি কোন লোককে বিবেচনাশক্তিরহিত দেখা যায়, তবে অপর কাহারও উচিত তাহাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়া সুপথে চালিত করা। ইহা খুবই সত্য যে, শিশুকাল হইতে কাহাকেও উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে তাহার বিবেচনাশক্তির উৎকর্ষ আনয়ন করা যায়।

যদি কোন লোক সুস্থ মনের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে সকল সময় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সুবিবেচনার সহিত করিতেই হইবে। ভাবাবেগে চালিত হইলে বিবেচনাশক্তি হ্রাস পায়।

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২২।৩০

অর্থাৎ যাহারা বিষয়চিন্তায় মগ্ন, তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়দ্বারা এবং মন ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা আকৃষ্ট হয়। পরে সেই মন, জলাশয়ের তীরস্থ কুশাদিগুচ্ছ যেমন জলাশয় হইতে অলক্ষ্যে জল হরণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি হইতে তাহার বিবেককে (বিবেচনাশক্তিকে) হরণ করিয়া থাকে। ভাবাবেগ প্রশমিত হইলেই কার্য্য বা ঘটনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন, নতুবা ভ্রান্ত পথে চালিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

বিভিন্ন প্রকার মানব প্রকৃতি।

মানুষের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির স্ফুরণ অল্পাধিক সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সকলেরই একই প্রকার সহজাত বৃত্তি সাধারণভাবে বর্ত্তমান আছে, তথাপি সে সকল বৃত্তির পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই আমরা কোন লোককে শঙ্কাতুর, কাহাকেও কামুক, কাহাকেও বা কলহ-প্রিয় অথবা দাম্ভিক দেখিয়া থাকি। যাহাদের যে প্রকার সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রকটমান, তাহাদের সেই বৃত্তির প্রকৃতি বুঝিয়া জীবন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সংযমদ্বারা সেই বৃত্তিকে যথাসম্ভব নিরোধ করিতেই হইবে।

স্বভাব বা আত্মভাব সহজে পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। শঙ্কাতুর, কামুক, কলহপ্রিয় অথবা দাম্ভিক লোকের স্বভাবের রাতারাতি পরিবর্ত্তন হইবে না—হয়ত সারা জীবনেও তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে না। তাহাদের এমতাবস্থায় বুদ্ধিবিবেচনা পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া চলিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

শঙ্কা বা ভয় সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইহার শক্তি অতি প্রবল, এবং ভয় পাইয়া মানুষ যত বিব্রত হয় তত আর কিছুতেই হয় না। ভয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করে এবং পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে দেয় না—যাহার ফলে নানাপ্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা ও চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। ভয়ে মানুষ অপদার্থ হইয়া যায়। ভীত সন্ত্রস্ত লোকের জীবন দুঃখের আকর হইয়া থাকে। মানুষ ভয় পাইয়া না করিতে পারে এমন কুকর্ম্ম নাই। ভয়ে মানুষের দেহযন্ত্র সকল বিকল হইয়া যায়। মানসিক সুস্থতা নষ্ট করিতে ইহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। এই কথাটী অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, ভয় মানবের সহজাত একটী বৃত্তি—ইহা প্রত্যেক লোকেরই আছে এবং ভয়দ্বারা চালিত না হইয়া ভয়কে জয় করিবার ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভয়কে জয় করিতে না পারিলে জীবনে উন্নতির আশা কম।

ভয় পাওয়া যাহাদের স্বভাব তাহাদের ইহা জানা প্রয়োজন যে,

ভীত না হইলে ভয় কাহারও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না এবং ভয় স্বল্পস্থায়ী ভাব মাত্র। ইহাকে প্রশ্রয় না দিলে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ভয়কে তুচ্ছ মনে করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারিলে ভয় অচিরেই পলায়ন করিবে। ভীত হইয়া কোন কাজ করিলে ফল খারাপই হইবে। ভয়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয়ের প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কারণ বিশ্লেষণ না করিয়া শুধুমাত্র ভয়াতুর হইলে মহাবিপদেরই সম্ভাবনা। বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থায়, ভয়ের কোন ঘটনা বা বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলেও লোকে ভয় পাইতে পারে। গল্প আছে যে, কোন গ্রামে এক চোর রাত্রিকালে চুরি করিতে বাহির হইয়াছে এবং চৌকীদারও সেই সময় পাহাড়া দিবার জন্য বাহির হইয়াছে। গ্রামের একপ্রান্তে একটী শুষ্ক গাছ ছিল। চোর দূর হইতে সেই শুষ্ক গাছকেই চৌকীদার মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। অপরদিকে চৌকীদারও সেই গাছকে চোর মনে করিয়া হল্লা জুড়িয়া দিল। একই শুষ্ক গাছকে চোকীদার ভাবিল চোর এবং চোর ভাবিল চৌকীদার। উভয়ের বিভিন্ন মানসিক অবস্থাই ইহার জন্য দায়ী, কারণ শুষ্ক গাছ কখনও ভীতিজনক নহে। বহু লোকই এইরূপে কাল্পনিক ভয়ে কাতর হইয়া থাকে। ভয়ের কারণ যতটা অনিষ্ট করিতে পারিত, কাল্পনিক ভয় তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিয়া থাকে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে ও তাঁহার চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করিলে তীব্র ভয়ও বিদূরিত হয়।

ভগবান কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৪১
মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৪২
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ !
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥ ৪৩
শ্রীমদ্ভাগবত ৩ স্কঃ ২৫ অঃ

"আমিই প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্বজন্য পদার্থের নিয়ন্তা, আমি সর্ব্বপ্রাণির আত্মা, আমা ভিন্ন কাহারও সংসারভয় নিবৃত্ত হয় না। আমার ভক্ত কোথায়ও ভীত হয় না। আমার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়েই সূর্য্য উত্তাপ দেন, আমার ভয়েই ইন্দ্র বর্ষণ করেন ও অগ্নি দহন করেন। এমন কি যম পর্য্যন্ত আমার ভয়েই নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে ধাবিত হন। আমি আমার ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি। যোগিগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা নিজেদের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য আমারই সর্ব্বভয়হারী পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

পরমেশ্বরের সহিত যে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা যে অনুভব করিতে পারে সেই যোগী। এই নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করার জন্য শ্রীহরির শরণ লওয়া একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ। মানুষ এই নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া

থাকে এবং ভয়ে কাতর হয়। যোগিগণ সর্ব্বদা শ্রীহরির পাদমূলে আশ্রয় লইয়া চির আনন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

যৌনাকাঙ্ক্ষা—মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলির মধ্যে ইহা একটী শক্তিশালী বৃত্তি। কোন কোন লোকের এই আকাঙ্ক্ষা তীব্র, ফলে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না। এই জাতীয় লোকেরা অতৃপ্ত বাসনার জন্য মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদের মতে এই অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধির হেতু বলিয়া কথিত হয়। এই মত যুক্তিসহ কিনা তাহা বলা যায় না, তথাপি ইহা ঠিক যে, প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষকে নানাভাবে বিব্রত করিয়া থাকে। শান্তিকামী ব্যক্তি বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা এই বাসনাকে রোধ করিবে। যাহাদের তীব্র বাসনা আছে তাহাদের সকল অবস্থা বুঝিয়া চলিতে হইবে। কত অনর্থের মূলে যে এই তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান তাহার ইয়ত্তা নাই। এই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে পারিলেই যে ইহার নিবৃত্তি হইবে তাহাও নহে; ইহাকে প্রশ্রয় দিলে ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে মাত্র। কামুক লোক কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করে।

কলহপরায়ণতা—মানুষের জীবন বিষময় করিয়া তোলে। কলহপ্রিয় ব্যক্তি পরিবেশের সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে

সমর্থ হয় না। এরূপ ব্যক্তি নিজেই যে শুধু দুঃখ পায় তাহা নহে, তাহার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত অপরাপর সকলের জীবন সে অশান্তিময় করিয়া তোলে। কলহপ্রিয় ব্যক্তির ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাহার ক্রোধের উপশম এবং কলহ করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারিলে তাহার জীবনে শান্তি নাই।

ক্রোধ চণ্ডাল—তবু যদি কোন লোক ক্রোধের বশে গঠনমূলক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তবেই মঙ্গল, কিন্তু ধ্বংসাত্মক কার্য্য করিলে দুঃখের শেষ থাকে না।

আত্মগরিমা—নিজেকে জাহির করিবার তীব্র বাসনা অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। আত্মম্ভরিতা মানুষকে নিজের বিষয়ে এমন ভাবে সচেতন করে যে, সে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য লোকের কথা ভুলিয়া যায়, অন্যান্য লোকের অনুভূতিকে গ্রাহ্য করে না—যাহার ফলে তাহার কার্য্যদ্বারা সে নিজেই দুঃখকষ্ট বরণ করে। আত্মসচেতন ব্যক্তি সকল সময়ই নিজের ভাবনায় এত মত্ত থাকে যে, অন্যের ভালমন্দ সে গ্রাহ্য করিতে চাহে না। ফলে সকলের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের জীবন অশান্তিময় করিয়া তোলে। সেই ব্যক্তির অপরের সহিত খাপখাওয়ান কঠিন হয় এবং পরিণামে তাহার মানসিক সুস্থতা নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

ভাবপ্রবণতা—কতক লোক স্বভাবতই তীব্র বোধশক্তি সম্পন্ন (ভাবপ্রবণ)। ধীশক্তির পরেই বোধশক্তির স্থান দেওয়া যাইতে পারে। উত্তমরূপে চালিত হইলে ভাবপ্রবণ ব্যক্তি মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যাঁহাদিগকে আমরা যুগাবতার বলিয়া থাকি তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন। আবার যদি কুপথে পরিচালিত হয়, ভাবপ্রবণ ব্যক্তি সবকিছু গর্হিত কার্য্য করিতে পারে। প্রায়শঃ ভাবগ্রাহী ব্যক্তি সহজেই সকল অবস্থা বুঝিয়া পরিবেশের সহিত ঘনিষ্ট সহযোগিতা করিতে পারে। ভাবুক লোক নিজের বিষয়ে না ভাবিয়া অপরের বিষয়ে ভাবনা করিলে উত্তম ফল লাভ হয়। ভাবপ্রবণ ব্যক্তির তাহার ভাবুকতাকে সম্পদ বলিয়া মনে করা সমীচীন। কিন্তু সে যদি পারিপার্শ্বিক সকলপ্রকার ঘটনা বা অবস্থাকে তাহার সুখদুঃখের হেতু বলিয়া মনে করে তবে তাহা বিপদের কারণ হইয়া থাকে। যদি কেহ নিজের ভাবে মত্ত থাকে তবে জীবনের অনেক সুযোগ সুবিধার প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকা সম্ভব হয় না। স্বার্থচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে যাহাতে দৃষ্টি পড়ে সেদিকে তাহার সচেতন থাকা প্রয়োজন। স্বার্থচিন্তা যতদিন থাকিবে, মানুষ ততদিন শোক, দুঃখ, লোভ, ভয় প্রভৃতিতে কাতর হইবে। কেবল ঈশ্বর-আশ্রয়ই এই স্বার্থচিন্তা তিরোহিত করিতে পারে।*

---

* তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই নিজের সমালোচনা বা নিন্দা অপছন্দ করিয়া থাকে। সে সমালোচনা অপর কেহ করুক অথবা আত্মবিশ্লেষণ মূলকই হউক, কোনটাই তাহার প্রীতিকর হয় না। তাহার স্বভাবের এই প্রকৃতি হেতু যে কোন প্রকার সমালোচনা এড়াইবার জন্য সে নিম্নলিখিত উপায়সকল অবলম্বন করিতে চেষ্টিত হয়—

১। উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ ত্রুটীহীন হইবার চেষ্টা;

২। প্রতারণা (অসত্য আচরণ);

৩। কোপন-স্বভাব হইয়া অন্যকে চুপ করাইবার জন্য প্রথমেই তাহাকে দাবাইয়া রাখা; অথবা

৪। অসামর্থ্য জ্ঞাপন।

উৎকর্ষ সাধন—ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা সকল সময় এমন ন্যায্য কাজ করিতে চাহে যাহাতে কোন বিরূপ সমালোচনা সম্ভব না হয়। কিন্তু নির্ভুলভাবে ন্যায্য কাজ করা সকল সময় সম্ভব নহে;

তাবদ্ভয়ৈত্য সদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৯।৬

অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীহরিকে বলিলেন—জীবগণ যাবৎ কাল তোমার অভয়প্রদ পাদপদ্ম অনন্য ভাবানাদ্বারা আশ্রয় না করে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সর্ব্বদুঃখমূল স্বার্থচিন্তা বিদ্যমান থাকে, যাহার ফলে সম্পদ, নিজের দেহ, এবং দেহাশ্রিত স্বজন প্রভৃতির জন্য ভয়, শোক, আকাঙ্ক্ষা, ইষ্ট হানিতে দৈন্য ও বিপুল লোভ বর্ত্তমান থাকে।

কারণ, ন্যায্য ও অন্যায্য আপেক্ষিক কথা। যাহা একজনের নিকট ন্যায্য তাহা হয়ত অপরের নিকট অন্যায্য। সমালোচনা এড়াইতে যাইয়া যাহারা এইরূপ অবস্থায় থাকিতে চাহে, তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইতে বাধ্য হইয়া পরিবেশের সহিত গুরুতররূপে সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে।

প্রতারণা (বঞ্চনা)—সমালোচনা এড়াইবার জন্য শিশুরা প্রায়ই ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক সময় প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকেরাও ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রতারণার উদ্দেশ্য হইল অপরকে এইরূপ দেখান যে, সে যাহা করিতেছে তাহাতে সাধারণের অনুমোদন আছে, অথবা সে এমন ভাব দেখাইতে চাহে যে, সে কোন গর্হিত কর্ম্মই করে নাই। নৈতিক কারণ বাদ দিলেও ইহা বলা যায় যে, এই বঞ্চনার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই—আজ না হউক কাল এই প্রক্রিয়া ধরা পড়িবেই এবং তাহার ফলে তাহাকে আরও অধিক অপদস্থ হইতে হইবে।

কোপনতা—অনেক সময় সমালোচনা এড়াইতে যাইয়া মানুষ অতিশয় ক্রোধান্বিত হয় এবং মনে করে, লোকে তাহার এই ক্রোধ দেখিয়া সমালোচনা করিতে সাহস করিবে না। এই জাতীয় ব্যক্তিরা যখনই সুযোগ পায়, তখনই তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে বা বলিতেছে তাহাই সত্য আর অপর সকলে ভ্রান্ত, এই

কথা জোর গলায় প্রচার করে। তাহারা যেন বলিতে চাহে—

"নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরোধ করি,
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী,
স্পর্দ্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে।"

কিন্তু এই প্রক্রিয়া অসামাজিক, অসন্তোষজনক এবং অনাবশ্যক। কারণ এই শ্রেণীর লোক তাহাদের চড়া মেজাজের জন্য জনসমাজে আরও নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

অসামর্থ্য জ্ঞাপন—সমালোচনা এড়াইবার আর একটী প্রক্রিয়া। যে এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করে সে ইহাই বলিতে চাহে যে, যেভাবে সে কাজটী সম্প্যাদন করিয়াছে তাহা অপেক্ষা ভালভাবে কাজ করিতে সে অসমর্থ। সেই ব্যক্তি শান্তভাবে নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া সমালোচনা এড়াইতে চাহে। তাহাকে শত বুঝাইলেও সে তাহার দীনভাব পরিত্যাগ করে না।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তির ইহা বুঝা প্রয়োজন যে, সমালোচনা সহ্য করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, তথাপি তাহাকে দৃঢ়চিত্তে স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্পূর্ণভাবে সমালোচনা এড়াইবার কোন উপায় নাই। কারণ, কাহারও কোন কাজই সমালোচনার বাহিরে নহে। মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধুবান্ধব, এমন কি আপন

সন্তানেরা পর্য্যন্ত কারণে বা অকারণে দোষগুণের বিচার করিবেই; এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুসারে বিচার করিয়াই সমালোচনা করিবে। সমালোচনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার যখন কাহারও উপায় নাই, তখন সমালোচনা শুনিলে যাহাতে তাহা উপেক্ষা করিতে পারা যায় সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সৎস্বভাব সম্পন্ন হইতে হইবে।*

আভ্যন্তরিক প্রকৃতি (মেজাজ)—মেজাজের তারতম্যানুসারে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর লোক **আত্মমুখী**—গম্ভীরস্বভাব, সর্ব্বদা নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক চঞ্চলপ্রকৃতি—**বহির্মুখী** এবং অন্যান্য সকলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

যাহাদের স্বভাব আত্মমুখী তাহারা আত্মবিশ্লেষণকারী, কল্পনাবিলাসী এবং অপর কাহারও সহিত মিলামিশা করিতে অক্ষম অর্থাৎ অসামাজিক। তাহারা চিন্তা করে বেশী, কিন্তু কাজ করে কম।

যাহারা বহির্মুখী তাহারা ইহার ঠিক বিপরীত স্বভাবের। সহসা তাহাদের মেজাজের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে—কখনও উল্লসিত,

* কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সৌহৃদম্।
বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ শীলমেতদ্বিদুর্ব্বুধাঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৯।৩১
অর্থাৎ সকল প্রাণীতে কায়মনোবাক্যদ্বারা যে সৌহৃদ্যপূর্ণ আচরণ, তাহাকেই বিদ্যাবিবেক সম্পন্ন পণ্ডিতগণ সৎস্বভাব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কখনও বা বিষাদগ্রস্ত। এইরূপ স্বভাবের লোকেরা সহজেই অপরের সহিত বন্ধুতা করিতে চাহে এবং সফলও হয়। তাহারা সামাজিক বলিয়া পরিচিত হয় এবং অনেক বিষয়ে তাহাদের মাথা খেলিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই জাতীয় লোকের বিবেচনাশক্তি কম এবং যে কোন ঘটনায় অত্যধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অবশ্য যে কোন ব্যক্তিরই উপরি লিখিত দুইটী ভাবই একত্রে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কাহারও কাহারও এই দুইটী ভাব এত অল্প পরিমাণে থাকে যে, তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন লোকের মধ্যে ভাব দুইটী এত অধিক মাত্রায় থাকিতে পারে যে, তাহা মানসিক ব্যাধির পর্য্যায়ে পড়ে। মানসিক সুস্থতা রক্ষা করিতে হইলে মেজাজকে সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। আত্মচিন্তায় মগ্ন লোকের অপরের সহিত মিশিবার অভ্যাস করা সমীচীন। আত্মসর্ব্বস্ব না হইয়া বাহির জগতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য এবং নির্জ্জন-চিন্তাবিলাসী না হইয়া যে কোন কাজে মন দেওয়া আবশ্যক।

যাহারা বহির্মুখী স্বভাবের তাহাদের সংযত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এবং ভাবাবেগে চালিত না হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিজের প্রকৃতি বুঝিয়া সকল সময় সাবধান থাকা সমীচীন, সাময়িক উল্লাস অথবা বিষাদ লইয়া ব্যাপৃত হওয়া সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-শীলতার বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতিপদে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

মনোভাবের যাহাতে দ্রুত পরিবর্ত্তন না হইতে পারে, সে বিষয়ে দৃঢ়রূপে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোন কোন সময় তাহাদের এই উল্লসিত ভাব এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে যে, তাহারা নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারে না। অথচ সেই প্রচ্ছন্ন উল্লাসের বশে মূর্খের মত আচরণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় লোকেরা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া যে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, অথবা এমন কাজ আরম্ভ করে যাহা কোন দিনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং খুব সম্ভব সে কাজ তাহার ক্ষমতার অতীত। উল্লসিত অবস্থায় যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যদি সেই সময় সুযোগ ঘটে তবে অবৈধভাবে অবিবেচকের ন্যায় কাহারও সহিত হয়ত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসে, যাহার ফলে পরে তাহাকে অনুতাপ এবং নানাবিধ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। সংযমী না হইতে পারিলে দুঃখদুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী।

এই জাতীয় স্বভাবের লোকের উল্লাসের পর বিষাদভাব আসিবেই এবং ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত নহে। সে সময় আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, সেই বিষণ্ণ অবস্থায় অনেকে নিজেকে পাপী বলিয়া ভাবিতে থাকে। এই প্রকার দুশ্চিন্তার ফলে অচিরেই মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে। সাময়িক বিষাদভাবকে গুরুত্ব দিলে অধিকতর বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

এরূপ মেজাজের লোকদের খুব বিচার বিবেচনা করিয়া চলা প্রয়োজন। সে যেন অর্থহীন কার্য্যে সারাদিন ব্যস্ত না থাকে।

এই জাতীয় স্বভাববিশিষ্ট লোকদের বিশেষভাবে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানসিক সুস্থতা রক্ষা করিতে হইলে তথা শান্তিতে জীবন ধারণ করিতে হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই সংযমী হইতে হইবে। তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যতালিকায় খেলা, বিশ্রাম ও ব্যায়ামের বিশিষ্ট স্থান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। উল্লাসবশে অথবা বিষাদগ্রস্ত হইয়া যেন কোন প্রকার অবাস্তব ব্যাপারে জড়িত না হইয়া পড়ে সে দিকে তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ **শক্তিমান ও ক্রিয়াপটু**, আর কতকগুলি লোক স্বভাবতই দুর্ব্বল প্রকৃতির ও **অলস**। অলস লোকের কোন সুখ নাই। মানুষের উন্নতির অন্তরায় যাহা কিছু আছে তন্মধ্যে আলস্যই সর্ব্বপ্রধান। সংসারে যাহা কিছু কাম্য তাহাই পরিশ্রমলভ্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কি আপনার, কি অপর কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। বিশেষতঃ অলস লোকের মাথায় নানা কুবুদ্ধি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অলস ব্যক্তি নানারূপ দুর্গতি ভোগ করে। দুর্ভাবনা অলস লোককে পাইয়া বসে এবং তাহার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। অলস প্রকৃতির লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে; তাহা হইলেই সে শীঘ্র বুঝিতে পারিবে যে, কর্ম্মে আনন্দ আছে।

এখানে একটী পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৃন্দাবনে অনাবৃষ্টির ফলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বৃষ্টির দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য নিজ নিজ কর্ম্ম ভুলিয়া যজ্ঞের

আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন। গোপদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কর্ম্মবিমুখ হইয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নিষ্ফলতা বুঝাইলেন এবং কর্ম্ম করার সার্থকতার বিষয়ে বলিলেন—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১৩
অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যণ্য কর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্য কর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ১৪
কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশে নান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম ॥ ১৫
স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৬
দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ ১৭
তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কঃ ২৪ অঃ

জীব মাত্র কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম দ্বারাই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আবার সুখ, দুঃখ, ভয় ও কুশল কর্ম্মদ্বারাই লাভ হয়। স্বয়ং কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়াও অন্য জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যদ্যপি থাকেন তিনিও কর্ম্মফলদান দ্বারা কর্ম্মেরই ভজনা করেন, কেন না যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করে তাহার তিনি প্রভু নহেন

অর্থাৎ ফলদানে সক্ষম হইতে পারেন না। অতএব কর্ম্ম হইতেই যদি ফল সিদ্ধি হইল এবং সকলে যদি কর্ম্মেরই পরতন্ত্র হইয়া পড়িল, তবে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণিগণের ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? প্রাক্তন সংস্কার (সহজাত প্রবৃত্তি) কর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্র বা কোন দেবতারই শক্তি নাই। বস্তুতঃ প্রাণী মাত্রই স্বভাবের পরতন্ত্র, সকলেই স্বভাবেরই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। অতএব দেবতা, অসুর ও মানব সহ এই সমস্ত সংসার স্বভাবদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আবার জীব সকল কর্ম্মদ্বারাই বিবিধ দেহপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করে। কর্ম্মদ্বারাই শত্রু মিত্র অথবা উদাসীন বলিয়া অপরের নিকট প্রকটিত হয়। অতএব কর্ম্মই সকলের গুরু, কর্ম্মই ঈশ্বর অর্থাৎ স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন কর্ম্মই সকলের কারণ, সুতরাং কর্ম্মই পূজ্য। অতএব স্বভাবস্থ হইয়া স্বীয় কর্ম্মকারী পুরুষের কর্ম্মেরই আদর করা কর্ত্তব্য।

যাহার যে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার পক্ষে সেই কর্ম্মকেই পরম দেবতা মনে করা কর্ত্তব্য।

অতি উৎসাহী কর্ম্মঠ ব্যক্তিদেরও বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, নচেৎ উৎসাহের আতিশয্যে এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে যাহা তাহার পক্ষে মোটেই মঙ্গলপ্রদ হইবে না। স্বভাবতঃ যাহারা প্রবল কর্ম্মশক্তিমান তাহাদের গঠনমূলক কার্য্যে আত্ম-

নিয়োগ করা প্রয়োজন, নতুবা ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া মহা অনর্থের কারণ হইতে পারে।

অপরের ইঙ্গিতে কার্য্য করা—অনেক সময় এরূপ লোক দেখা যায় যে, সে অপরের ইঙ্গিতে কাজ করিয়া থাকে। যাহাদের আপন বিবেচনাশক্তির উপর বিশ্বাস কম তাহাদেরই অপরের কথায় চালিত হইবার অধিক আগ্রহ দেখা যায়। যাহাদের কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান আছে তাহাদিগকে ভুল বুঝান সহজ নহে। যে লোক যত নির্ব্বোধ সে তত অপরের কথায় চলিয়া থাকে। অপরের ইঙ্গিতে যে চলে সে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, ফলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভুগিয়া থাকে। অবশ্য এরূপ স্বভাবের লোকদিগকে কথায় ভুলাইয়া তাহাদের নানারূপ ব্যাধি হইতে মুক্ত করা সম্ভব।

শুধু যে নির্ব্বোধ লোকই অপরের কথায় ভুলিয়া থাকে তাহা নহে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া যাহাদের খ্যাতি আছে, তাহারাও অনেক সময় অপরের ইঙ্গিতে চলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় অপকর্ম্ম করিয়া থাকে। এরূপ স্বভাবের ব্যক্তিকে সকল সময় সকল কাজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অসৎ সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যহ মিথ্যা কথা শুনিতে শুনিতে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কত ধূর্ত্ত লোক সহস্র সহস্র লোককে বিপথে চালনা করিয়া নিজেদের অভীষ্ট কার্য্য

করাইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে দুর্ঘটনা কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে ঘটিত না, তাহা অপরের কথা বিশ্বাস করিবার ফলে ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনে কোন খারাপ ঘটনার সম্ভাবনার কথা বলিয়া কত লোক যে কত লোককে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিতে করিতে লোক মানসিক বল হারাইয়া ফেলে এবং সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অপরের প্ররোচনায় অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সকল সময় ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুঃখ কষ্টের ভাবনা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। বরং ইহাই ভাবিতে হইবে যে, ঈশ্বর কৃপাময় —তাঁহার কৃপায় ভবিষ্যৎ মঙ্গলপ্রদ হইবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বহু সুযোগ সুবিধা আসিবে। বর্ত্তমানে যে সম্পদ আছে তাহাই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। অনাগত দুঃখ কষ্টের কল্পনা করিয়া মানসিক সুস্থতা নষ্ট করিবার কোন সার্থকতা নাই। ভগবানের নাম স্মরণে রাখিয়া তাহাকে আশ্রয় করিলে কোন অমঙ্গলই কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না। শ্রীহরির নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে মানসিক যন্ত্রণা হইতে সহজেই মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও চিকিৎসকের নিকট হইতে অহেতুক আশঙ্কার কথা শুনিয়া অনেকে মানসিক সুস্থতা হারাইয়া ফেলে। যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। যুক্তি সহকারে সকল দিক বিচার বিবেচনা

করিয়া কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি সাধারণ গণৎকারের গণনায় বিশ্বাস করিয়া নিজের সাধ্বী পত্নীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সেই হতভাগ্য তাহার অতীত ভুলিয়া গেল, একবার বর্ত্তমানের দিকেও চাহিল না, শেষে এক ভবিষ্যৎ-বক্তার কথায় অপকর্ম্ম করিয়া বসিল! ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

যাহারা শান্তি চাহে তাহারা শ্রীহরিকে আশ্রয় করিয়া সুস্থচিত্তে অনায়াসে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে পারে। শ্রীহরির নাম সর্ব্বদুঃখনাশক—ইহার শক্তি অমোঘ।

পঞ্চম অধ্যায়

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্য।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর মনের সুস্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সংসারে প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধি, বিবেচনা, শক্তি ও আবেগ প্রভৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার জীবনধারা রচনা করে এবং সেইভাবে তাহার জীবন গঠিত হয়। জীবনের নানা অবস্থায় মানুষের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দীক্ষা তাহার বোধশক্তি জাগ্রত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনোভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল—

কোন কুকুর যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন লালা নিঃসরণ হইয়া থাকে। সেই সময় যদি একটী ঘণ্টা বাজান হয় অথবা একটী আলো জ্বালান হয়, তাহা হইলে কিছু কাল পরে, কোন খাদ্য না দিয়া শুধু ঘণ্টা বাজাইলে অথবা আলো জ্বালাইলেই সেই কুকুরের লালা নিঃসরণ হইবে। অর্থাৎ মূল যে কারণের যে প্রতিক্রিয়া ছিল, সেই প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ পরিবর্ত্তিত হইল।

মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, যদি কাহারও ডাগর চোখের কোন সন্তান থাকে, তাহা হইলে অপরের ডাগর চোখের

সন্তান দেখিয়া তাহার বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইবে। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তির আচরণ বুঝিতে হইলে তাহার অতীত জীবনের সকলপ্রকার অভিজ্ঞতার বিবরণ জানা প্রয়োজন। প্রকৃত কারণ অবর্ত্তমানেও তদ্বৎ কারণে সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল এই যে, মানুষের মনোভাব সর্ব্বদা বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ, প্রকৃত হেতু বর্ত্তমান না থাকিলেও তদ্বৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিশেষ প্রকার মনোভাবের উদয় হইয়া থাকে এবং মানুষ তদনুযায়ী আচরণ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি নিজের পছন্দ ও অপছন্দ লইয়া অতিরিক্ত মাথা ঘামায় সে সহজেই পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে। কারণ, তাহার মানসিক চিন্তাধারা বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে না, তাহার কাল্পনিক পছন্দ বা অপছন্দের উপর নির্ভর করিতেছে।

বহু লোক অকারণে শঙ্কাতুর হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যের ফলে ভয় বা দুঃখ পায়, তাহা হইলে স্বভাবতই সে সেই কার্য্যে উৎসাহ বোধ করে না। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে, যদি কোন লোক একবার কোন জনাকীর্ণ স্থানে যাইয়া অসুস্থ বোধ করে, তবে পুনরায় সেইরূপ জনাকীর্ণ স্থানে যাইতে সে অহেতুক ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। হয়ত তখন অসুস্থ হইবার কোন লক্ষণই তাহার দেহে বর্ত্তমান নাই, তথাপি পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা

তাহাকে ভীতিবিহ্বল করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় সে জনাকীর্ণ স্থানে যাওয়া বন্ধ করে এবং ক্রমে তাহার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

অহেতুক আশঙ্কা বা ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে এইরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বুঝিতে হইবে এবং বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া মনোভাবের সাম্য আনয়ন করিতে হইবে। উপরে যে প্রকার মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার প্রতিকারের উপায়ও আছে। যদি কেহ চুন খাইয়া গাল পোড়াইয়া দধি খাইতে ভয় পায়, তাহা হইলে সেই ভয় দূর করিতে হইলে তাহার সম্মুখে দধি খাইয়া এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ দধি খাওয়াইয়া বুঝান যাইতে পারে যে, তাহার ভয় অমূলক। যে গরু একবার অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সে রক্তবর্ণ মেঘ দর্শনেও অগ্নি ভ্রমে ভীত হয়—লক্ষণা সাদৃশ্যে বিপদাশঙ্কা করে। কিন্তু যদি তাহাকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দিবার ছলে সেই সিঁদুরে মেঘ দেখান হয় এবং যদি এইভাবে কয়েক দিন সিঁদুরে মেঘ তাহার নয়নগোচরে আসে, তবে সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে, সিঁদুরে মেঘ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে তাহার বিপদাশঙ্কা দূর করান সম্ভব।

শিশুরা একবার কোন ব্যাপারে ভয় পাইলে অনুরূপ ব্যাপারে পুনরায় ভয় পাইবার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ ভয়কাতর শিশুদের কোন প্রলোভন দেখাইয়া অনুরূপ ব্যাপারের সম্মুখীন করিতে পারিলে তাহাদের ভয় দূর করা সম্ভব হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শৈশবের শিক্ষা ও পরিবেশ।

শিশুকাল যে প্রকার শিক্ষায় ও পরিবেশে অতিবাহিত হইয়াছে তাহার উপর বহুল পরিমাণে মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শিশু-কালেই যাহতে সুষ্ঠুভাবে জীবন গঠন করা সম্ভব হয় সে দিকে অভিভাবকের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিশুকে প্রথম হইতে যেরূপ ভাবে চালিত করা হইবে, সে সেরূপ ভাবেই চলিতে শিখিবে। শিশুকে অতি সহজেই সুপথে বা কুপথে পরিচালিত করিতে পারা যায়। তাহাকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব যাহাতে সে সহজাত কামনা বাসনা নিরোধ করিতে সমর্থ হয়। আবার তাহাকে কামনা বাসনার দাস হইতেও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকে যেমন সমবয়সীদিগের সহিত মিশিতে শিখান যাইতে পারে, তেমনি কলহ করিতেও শিখান সম্ভব। মূলতঃ সমস্তই শিশুর শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

শিশুকালই প্রকৃষ্ট সময় যখন তাহাকে নানাভাবে উপদেশ দেওয়া যায় এবং সেই উপদেশ কার্য্যকরী হয়। এই সময় যে কোন একটি বিষয়কে শিশুর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া মনে করান যাইতে পারে, এবং সেই বিষয়টী যে সর্ব্বসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তাহাও তাহাকে বুঝান যাইতে পারে। এই শিশুকালেই তাহাকে নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে শিখান যায়, আবার দশজনের জন্য

ভাবিতেও শিখান যায়। শিশু তাহার চারিপার্শ্বে যাহা দেখে, যাহা শোনে তাহার দ্বারাই তাহার চিন্তাধারা স্থির করে। তাহারা বহুপ্রকার ভাবাবেগ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদের নিকট হইতে অর্জ্জন করে। তাই কলহপ্রিয় পিতামাতার সান্নিধ্যে শিশু কলহ-প্রিয় হইবে তাহার সম্ভাবনাই অধিক। সেইরূপ শঙ্কাতুর পিতা-মাতার সান্নিধ্যে অচিরেই শিশু শঙ্কাতুর হইয়া উঠিবে। মোট কথা শৈশবের অভিজ্ঞতা মানুষের মনে চিরস্থায়ী রেখাপাত করিয়া থাকে।

শিশুকালে যাহাতে স্বাভাবিকভাবে চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ হইতে পারে সে জন্য যাহাদের উপর শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে তাহাদের কতকগুলি নিয়ম অবশ্য পালনীয়। শিশুদেরও কতকগুলি বাধানিষেধ প্রতিপালন করিতে হইবে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য উত্তমরূপে গঠন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—

(১) অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, পিতামাতার আদর্শা-নুযায়ী ইচ্ছামত শিশুকে গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। তখন অবাধ্যতা হেতু তাহার স্বভাব সংশোধনের জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। সকল দিক বিবেচনা না করিয়া শিশুকে শাস্তি দিলে তাহাতে কুফলের সম্ভাবনাই অধিক।

(২) শিশুকে নিজেদের সম্পত্তিবিশেষ মনে না করিয়া, একটী জীবন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে এরূপই মনে করা পিতামাতার কর্ত্তব্য।

(৩) পিতামাতার কর্ত্তব্য হইল কি ভাবে শিশুকে সমাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া। সেই জন্য শিশুর যে সকল স্বাভাবিক গুণ আছে তাহারই স্ফুরণ করিতে সাহায্য করা প্রয়োজন।

(৪) যদি কোন শিশু কারিগরী কাজ মন দিয়া করিতে চাহে অথচ লেখাপড়ায় মোটেই মন দিতে চাহে না, তখন তাহাকে লেখাপড়ার জন্য বৃথা পীড়ন না করিয়া, যাহাতে কারিগরী শিক্ষাই উত্তমরূপে লাভ করিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করাই সমীচীন। হয়ত এরূপ ব্যবস্থা পিতামাতার মনোমত হইবে না; কিন্তু শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করিলে ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

(৫) শিশুদের মন যাহাতে উদ্বেগশূন্য থাকে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(৬) শিশুদের সম্মুখে কলহ করা পিতামাতার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য।

(৭) আর্থিক অনাটন অথবা অন্য কোন প্রকার ঝঞ্ঝাটের বিষয় যাহাতে শিশুদের গোচরে না আসে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৮) যতদূর সম্ভব বিনা বাধায় শিশুদের বড় হইতে দেওয়া প্রয়োজন। শিশুরা শঙ্কটসঙ্কুল কাজ করিতে শিখুক, তাহাদের পদে পদে বাধা দেওয়া অনুচিত। সত্য কথা বলিতে কি,

শিশুদিগকে নিস্তেজ করিয়া রাখার অর্থ তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার করিয়া দেওয়া।

(৯) একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা এই যে, পিতামাতার এরূপ জীবন যাপন করিতে হইবে যাহা দেখিয়া শিশুরা নিজেদের জীবন উত্তমরূপে গঠন করিতে পারে। পিতামাতার আচরণ শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, ইহা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে সকল সময় সংযতভাবে চলিতে হইবে। শিশুরা তাঁহাদের পিতা-মাতাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় আদর্শ-চ্যুত পিতামাতা শিশুদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। শুধুমাত্র ভাল ভাল উপদেশ দিলেই চলিবে না, ভাল ভাল কাজ করিয়াও তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে। কারণ শিশুরা পিতামাতার উপদেশ অপেক্ষা তাহাদের কাজ দেখিয়াই অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

(১০) পিতামাতার পক্ষে শিশুদের সহিত সদয় ব্যবহার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহাদিগকে স্নেহ মমতায় বশে আনয়ন করিয়া নিজেদের মনের মত করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব শুধুমাত্র শাসন করিয়া তাহাদিগকে বশে আনয়ন করা দুঃসাধ্য না হইলেও কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(১১) শিশুদের এরূপভাবে চালিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা নিয়মানুবর্ত্তিতা মানিয়া চলিতে শিখে। যে শিশু পিতামাতার আদেশানুসারে নিয়মানুবর্ত্তী হয়, সে কিছুকাল হয়ত

সেরূপ থাকিবে, কিন্তু একটু বয়স হইলেই তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি আসিবে এবং সে অনায়াসে তাহার উপায়ও খুজিয়া পাইবে। সে অবস্থায় পরিণাম অবশ্যই শুভ হইবে না।

(১২) "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ"—এই বাক্যটী অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলেও, ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া অভিভাবক-দিগকে চলিতে হইবে। প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুকে লালন পালন করিতে হইবে। এ সময় কোন প্রকার শাস্তিদানের কথাই উঠে না। শিশুর ছয় বৎসর বয়স হইতে কখন কখন তাহাকে নিশ্চয়ই শাস্তিদান করিতে হইবে। কারণ শাস্তি পাইবার ভয় না থাকিলে উচ্ছৃঙ্খল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য, শিশুকে যে কোন শাস্তিই দেওয়া হউক না কেন, তাহা যেন মাত্রা অতিক্রম না করে, ক্রোধের বশে যেন শাস্তি দেওয়া না হয় এবং সহৃদয়তার যেন অভাব না ঘটে। শিশুর মঙ্গলের জন্যই তাহাকে শাস্তি দেওয়া; অভিভাবকের ক্রোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শাস্তি দিলে উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে।

দৈহিক শাস্তি শিশুর পক্ষে মঙ্গলপ্রদ কি না সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। যদি দৈহিক শাস্তি দিতেই হয় তবে তাহা সর্ব্বশেষে প্রযোজ্য। যখন শিশুকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখন ইহাই বুঝাইবে যে, সে শিশুকে প্রথম হইতেই উত্তম-রূপে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। সে ক্ষেত্রে হয় শিশুর পিতামাতা শিশুর শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন নতুবা অজ্ঞ। মোটের উপর বিচার

করিলে দেখা যায় যে, দৈহিক শাস্তির ফলও ভাল নহে। যদি দৈহিক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজনই হয়, তবে পিতামাতার যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া তাহা প্রয়োগ করা সমীচীন।

(১৪) শিশুদের সকল কাজই খুঁটিনাটির সহিত দেখার প্রয়োজন নাই। যদি কোন কার্য্যে সে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয় তবে তাহাকে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিলে শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবে না।

(১৫) পিতামাতার ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদের সন্তান সকল সময় তাহাদের অভিপ্রায় মত চলিবে না। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার মনোভাবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শিশু এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই। তথাপি যদি কোন পিতামাতা এরূপ আশা মনে পোষণ করেন তবে তাহাদের দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। শুধু তাহাই নহে, পিতামাতা যদি মনে করেন যে, তাহাদের সন্তান তাহাদের সব কথা শুনিয়া চলিবে, সে ক্ষেত্রে শিশুর জীবনও দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে।

(১৬) শিশুকে সকল সময় তিরস্কার করা অযৌক্তিক ও অশোভন। সর্ব্বদা তিরস্কার করিলে শিশুর কোন মঙ্গলত হইবেই না, বরং ইহার ফলে সে আরও অবাধ্য হইবে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, শিশুকে আদর দিয়া নষ্ট করিতে হইবে।

(১৭) অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, পিতামাতা স্নেহের

আতিশয্যে শিশুরা যাহা আবদার করে তাহাই পূরণ করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে শিশুর কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকেন। যে সকল শিশুকে পার্থিব দ্রব্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা হয় তাহারা মনে করে যে, সকল জিনিষই অনায়াসলভ্য। ফলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা যখন দেখিতে পায় যে, সকল জিনিষই মূল্য দিয়া কিনিতে হয় তখন তাহারা ঈপ্সিত বস্তু ইচ্ছামত সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং শিশুর সকল আবদার পূরণ করিবার প্রয়োজন নাই—সে বুঝিতে শিখুক যে, চাহিবা মাত্রই সব কিছু লভ্য নহে। শিশুকাল হইতেই এই অসুবিধা সহ্য করিতে অভ্যাস করান ভাল। তাহা হইলে ভবিষ্যত জীবনে ইচ্ছামত কোন কিছু না পাইলে যে মানসিক চঞ্চলতা আসিয়া থাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে।

(১৮) শিশু যেন সকল সময় সকল কাজেই পিতামাতার উপর নির্ভর না করিতে শিখে, সে বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই পরনির্ভরতা শিশুর স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত করে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও আত্মবিশ্বাসের অভাবে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া থাকে। এজন্যই দেখা যায় যে, যে পুত্র মাতার অতি বাধ্য এবং মাতার উপর অতি নির্ভরশীল, সে প্রায়শঃ ভবিষ্যৎ জীবনে সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং আদর্শ স্বামী হইতে অপারগ হয়। সেরূপ পিতার

স্নেহশীলা কন্যা পরে আদর্শ বধূ হইতে পারে না। ইহাদ্বারা অবশ্য ইহা বুঝাইবে না যে, পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করিবেন না অথবা সন্তানগণ পিতামাতাকে ভালবাসিবে না। প্রকৃত কথা এই যে, সন্তানকে যেন অত্যধিক স্নেহ করা না হয়। স্নেহাতিশয্য সন্তানের মঙ্গল না করিয়া অনর্থই ঘটায়। আবার সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহ পিতামাতার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

(১৯) শিশুরাই কালে বড় হইয়া বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে এবং তাহারাই দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিবে। সুতরাং শিশুদিগকে উত্তমরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অভিভাবকের সস্নেহ পরিচালনায় শিশুগণ ভবিষ্যতে উত্তমরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিবে। তাহাদিগকে খেলাধূলায় উৎসাহ দিতে হইবে। তাহাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা অপরকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিতে পারে, তাহারা যেন সহিষ্ণু হইতে পারে, তাহারা যেন অপরের গুণগুলি বড় করিয়া দেখিতে পারে এবং দোষগুলি অনুকরণ না করিতে শিখে। তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যেন তাহারা সকল কাজ সন্তোষজনকভাবে করিতে পারে—গোজামিল দিয়া যেন কিছু করিতে চেষ্টা না করে। শিশুগণ যেন কাজ করিতে ভয় না পায়; তাহাদিগকে কাজে উৎসাহ দিতে হইবে। যে শিশুকে কোন কাজ করিতে দেওয়া হয় না সে ক্রমে অপদার্থ হইয়া যায় এবং নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকে।

তাহাদিগকে এরূপ শিখাইতে হইবে যে, তাহারা যেন কোন কার্য্যের ফলাফল লইয়া মাথা না ঘামায়। তাহাদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিতে শিখাইতে হইবে, এবং যে কার্য্যদ্বারা অপর সকলের উপকার হইবে সেরূপ কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া তাহাদিগকে বিব্রত করা সঙ্গত নহে। শিশুর আস্তিক বুদ্ধি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যৌনজ্ঞান বিষয়ে যাহাতে তাহাদের কৌতূহল না জন্মে সে দিকে অভিভাবকদিগের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(২০) যতটা সম্ভব শিশুকে তাহার পিতামাতার সান্নিধ্যে রাখা প্রয়োজন। দাসদাসীর হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার প্রদান সমীচীন নহে, কারণ শিশু যাহা দেখিয়া থাকে তাহাই মনে করিয়া রাখে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত তাহাদের শিশু সন্তানদের লালন পালনের ভার দাসদাসীর উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। সিন্ধুকের চাবিটী তাহারা কখনও হাতছাড়া করেন না এই ভয়ে যে, কেহ হয়ত সিন্ধুকস্থ মূল্যবান সামগ্রী হরণ করিবে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারাই নিজ সন্তানবর্গের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া তাহাদিগকে নিম্নস্তরের লোকদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেন। ফলে দেখা যায় যে, সেই সকল শিক্ষিত লোকের সন্তানগণ কুমতিপ্রবণ হইয়া পড়ে।

(২১) শিশুদের খেলার সাথী থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেই সকল সাথী যেন অবাধে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে।

প্রত্যেক শিশুরই ভাই ও বোন থাকা প্রয়োজন। যে শিশু একাকী থাকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কোন পরিবারে একাধিক শিশু থাকিলে সেই পরিবারের শিশুদের সদ্‌গুণ আপনিই আসে।

(২২) শিশুদিগকে সময়োপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় জানান প্রয়োজন। অভিভাবকের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শিশুদের সহিত যথাযোগ্য আলাপ আলোচনা করা হিতকর। শিশুরা বড় হইলে তাহাদিকে অন্যান্য সমবয়স্কদিগের সহিত মিলা মিশা করিতে দেওয়া উচিত। কখনও কখনও হয়ত ইহার ফলে শিশুরা কিছু খারাপ অভ্যাস শিখিতে পারে, কিন্তু পিতামাতার পক্ষে তাহা সংশোধন করা সম্ভব।

(২৩) শিশুরা যখন কোন কাজ করিতে ভয় পায় অথবা লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ দিতে চাহে না, তখন অভিভাবকের পক্ষে ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। যাহাতে শিশু নির্ভয়ে কাজ করিতে সমর্থ হয় অথবা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে সে বিষয়ে সযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। সারাদিন বকাবকি করিলে অথবা দৈহিক শাস্তি দিলে কুফলেরই সম্ভাবনা অধিক। বিচক্ষণ অভিভাবক শিশুর জীবন সুষ্ঠুভাবে গঠন করিতে নানাভাবে চেষ্টা করিতে পারেন। অবশ্য, ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলেই যে, সকল শিশু সমভাবে মানুষ হইবে তাহা নহে। শিশুর ভবিষ্যৎ তাহার প্রকৃতিগত গুণাবলীর উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে।

(২৪) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা শিশুর পক্ষে অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যে গৃহে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হইয়াছে সে গৃহে শিশু সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে। পিতৃহীন বা মাতৃহীন শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবদারে হইয়া থাকে। যে গৃহে পিতামাতা কলহপ্রিয় সে গৃহে শিশু স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। শঙ্কাতুর পিতামাতা তাহাদের সন্তানদিগকে শঙ্কাতুর করিয়া তুলিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশুদিগকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে না পারিলে অনেক সময় শিশুরা স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভুগিয়া থাকে।

(২৫) যে গৃহ মনোমালিন্য, কলহ, বিবাদ ও ব্যভিচারে পূর্ণ সে গৃহে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা একপ্রকার অসম্ভব। যদি সে গৃহের দোষগুলি সংশোধন করা সম্ভব না হয় তবে শিশুর মঙ্গলের জন্য তাহাকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন।

(২৬) শিশুর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। এই সময় তাহার মানসিক চাঞ্চল্য ঘটিবার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশু নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়, সে নূতন কোন বিষয়ে হয়ত কোন মীমাংসাই করিতে পারে না এবং নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া হয়ত প্রকৃত সমস্যাটী ভুলিয়া যায়। শিশুদের পিতামাতা, শিক্ষক এবং গৃহচিকিৎসক তাহাদিগকে ঠিক পথ দেখাইয়া দিতে পারেন এবং তাহাদিগকে মানসিক অস্থিরতা হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

(২৭) শিশুগণ অপরের কথা সহজেই বিশ্বাস করে। তাহা-দিগকে অযথা ভয় দেখান বয়স্ক লোকদিগের কখনও উচিত নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কাল্পনিক ভূত, পেত্নী, রাক্ষস প্রভৃতির কথা বলিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইয়া শান্ত করা হইয়া থাকে। শিশুকে এক মাত্রা বিষ দেওয়া অপেক্ষা ইহা কোন ক্রমেই কম অপরাধজনক নহে।

(২৮) শিশুকে প্রলোভন দেখাইয়া হয়ত কোন কাজ করান হইল এবং কাজ শেষ হইবার পরে তাহাকে সেই প্রলোভনের বস্তু না দিয়া ফাঁকি দেওয়া হইল—ইহার ফলে শিশু প্রতারণা শিখে।

৪ বৎসর হইতে ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বহু শিশুর আচরণ বিসদৃশ হইয়া পড়ে। মিথ্যা কথা বলা, চুরিকরা অথবা অবাধ্যতা করা যেন তাহার স্বভাব বলিয়া মনে হয়। এইরূপ বিসদৃশ আচ-রণের অর্থই হইল এই যে, শিশু তাহার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ঠিকভাবে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। আবার ১০ বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে কোন কোন শিশুর আচরণে অধিকতর অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। প্রায় এই সময়েই আরও দুইটী মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকট আশঙ্কা, এবং (২) নানাপ্রকার অহেতুক শঙ্কা। কাহারও কাহারও আচরণে অসামঞ্জস্য কিশোর কাল আরম্ভ হইবার পরে আরও অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

কৈশোর কাল।

কিশোর বয়স আরম্ভ হইলে ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দশ বৎসর বয়সের পরে ইহার আরম্ভ এবং ১৫ বৎসর অথবা কিছু বেশী বয়স পর্য্যন্ত ইহার স্থিতি। কিশোর দশা উত্তীর্ণ হইলে মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয়। এই সময় তীব্র ভাবাবেগ প্রকাশ পায়। কিশোর কল্পনারাজ্যে বাস করে—বাস্তবতার ধার ধারে না। কিশোরদিগের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। ভাবাবেগে চালিত কিশোর সহজেই বিচলিত হইয়া থাকে। এই ভাবপ্রবণতা কিশোরকে সু অথবা কু এই দুই দিকেরই প্রান্ত সীমায় লইয়া যাইতে পারে। তাহাদের অপরিণত ধারণা তাহা-দিগকে চালিত করে এবং অনেক সময় কোন ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এরূপ কার্য্য করিয়া বসে যাহা বয়স্ক লোকের অসহ্য বোধ হয়। তথাপি সকল দিক বিবেচনা করিয়া অভিভাবকের পক্ষে কিশোরদিগের এইরূপ বিসদৃশ আচরণ সহ্য করা সমীচীন। কিশোরদিগের মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের আচরণ ও কার্য্য যতদূর সম্ভব সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, যাহার ফলে কিশোরের জীবন এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের জীবন দুঃখময় হইতে পারে। এই বয়স কঠিন শাসনের

সময় নহে। সস্নেহ ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে সবকিছু বুঝাইতে হইবে এবং ভাল মন্দ জানাইতে হইবে। কিশোরকে এরূপভাবে পালন করিতে হইবে যেন সে অস্বাভাবিক ভাবাবেগে অভিভূত হইতে সুযোগ না পায়। তাহাকে স্বাধীনভাবে চলিবার খানিকটা অধিকার দিতে হইবে। সে যাহাতে কুপথে না যায় এবং সামাজিক অমঙ্গলজনক কিছু না করে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে।

একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, শিশু অথবা কিশোর যখন কোন বিষয়ে ভাবনা করে তখন তাহার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। তাহারা এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সবে মাত্র প্রত্যক্ষ করিতেছে এবং উপলব্ধি করিতেছে। তাহাদের নিকট এই জগৎ রমণীয় ও রহস্যময় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহারা যে ভুলভাবে অনেক কিছুই গ্রহণ করিবে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের অনেক ভাবনা ও কার্য্য বয়স্ক লোকের নিকট অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে। তথাপি অভিভাবকদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কিশোর বয়সে ভাবপ্রবণতা অধিক পরিমাণে থাকিবেই, সুতরাং যতদূর সম্ভব তাহাদের কার্য্যগুলি সহ্য করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানোচিত হইবে। অভিভাবকগণের নিজেদের সেই বয়সের কথা স্মরণ করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে বিচার করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত কথা এই যে, কিশোরদিগকে যথাসাধ্য দয়া মায়া দেখাইতে হইবে। অহেতুক ভাবাবেগ, যথা ক্রোধ, আতঙ্ক, অপাত্রে ভালবাসা এবং নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তি কিশোর বয়সেই অধিক

পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। এ জন্যই অনেক সময় তাহাদের অনেক কাজ কোন যুক্তিরই ধার ধারে না।

কিশোর দশা মানব জীবনের এক বিপুল পরিবর্ত্তনের কাল। পিতামাতা বুদ্ধিমান ও বিবেচক হইলেই সন্তানদিগকে মঙ্গলের পথে চালনা করা সম্ভব। এই সময় একটী বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, কিশোর বালক তাহার মাতার প্রতি খুব অনুরক্ত হইয়া থাকে এবং পিতার কথা অপেক্ষা মাতার কথার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকে। সেইরূপ কিশোরী বালিকা পিতার প্রতি অধিকতর ভক্তিমতী হইয়া থাকে এবং মাতার কথা অপেক্ষা পিতার কথা অধিকতর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সময় পিতা-মাতার কর্ত্তব্য হইল সন্তানকে প্রকৃত পথে চালনা করা। মাতা যদি এই আকর্ষণের সুযোগ লইয়া পুত্রকে অতিরিক্ত বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভুল হইবে। সেইরূপ পিতা যদি কন্যার এইপ্রকার ভক্তিকে আমল দেন তবে কন্যার মাতার প্রতি বিরাগ-ভাব মনে বদ্ধমূল হইয়া তদ্‌স্থানীয়া সকলের প্রতি বিরাগভাব মনে দানা বাধিতে পারে, যাহার ফলে সেই কন্যার বিবাহের পর শ্বাশুড়ীর প্রতিও বিরাগভাব আসিয়া সাংসারিক অশান্তি ঘটাইতে পারে। সন্তানগণের এরূপ ব্যবহার ক্ষণিক ভাববিলাস মাত্র মনে করিয়া পিতামাতার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সংসর্গের দোষ গুন কিশোর অতি সহজেই পাইয়া থাকে, সেই জন্য অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত কিশোরদিগের যাহাতে সংসর্গ

না ঘটে সে দিকে পিতামাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। কিশোর বয়সে বিবেচনা শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া কিশোর অবাঞ্ছিত সংসর্গে মত্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে দুঃখ কষ্ট ও মনস্তাপ পাওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা ঘটে। ভাব-প্রবণ কিশোর হয়ত পড়াশুনায় অমনোযোগী হইয়া উঠে। সেই সময় অভিভাবকগণ যেন ধীর স্থির চিত্তে কিশোরকে পরিচালিত করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হয়ত অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন শিক্ষকগণ যেন সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে ঠিক পথে আনিবার চেষ্টা করেন।

কিশোর কালে যৌনাকাঙ্ক্ষার প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্বাভাবিক। ইহাকে এরূপ সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যে, সেই বহিঃপ্রকাশ যেন কিশোরের নিজের অথবা অপর কাহারও কোন অনিষ্ট না করিতে পারে। কিশোর কিশোরীরা এই সময় পরস্পর গল্পগুজব ও হাসি তামসা করিতে আগ্রহ দেখায়। পিতামাতার কর্ত্তব্য হইল উহাদিগকে সৎপথে চালিত করা যাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটিতে না পারে।

এই সময় হয়ত কোন কিশোরকে ভয়ে পাইয়া বসে। সে ভয় নানারূপে প্রকাশ পাইতে পারে, যেমন আত্মনিবিষ্টতা, অতিরিক্ত লজ্জা, অতি নম্রভাব এবং কোন কঠিন বিষয় এড়াইয়া চলা। এই সকল ভাবকে নৈতিক উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। কিশোর বা কিশোরীকে সমাজস্থ অন্য সমবয়সীদিগের নিকট হইতে

দূরে রাখিলে কুফলই হইবে। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাহাতে অব্যাহত থাকে সে দিকে পিতামাতার অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আত্মবিশ্বাস কিশোর বয়সের ধর্ম্ম—এই বিশ্বাসকে হতাদর করা উচিত নহে। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে কার্য্যের স্বাধীনতা দিতে হইবে। অবশ্য, সদুপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে চালিত করা প্রত্যেক পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য। আত্মবিশ্বাসে বলী হইয়া কিশোর যৌবনে পদার্পণ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া কিশোর বয়সের ধর্ম্ম—নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কিশোর কিশোরী নিত্যনূতন বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতে চাহে। খুব সম্ভব তাহার অনেক মতবাদ ও কার্য্য পিতা-মাতার মনোমত হইবে না, কিন্তু সে জন্য তাহাকে সকল সময় নিরস্ত করা সমীচীন হইবে না।

কিশোর দশা উত্তীর্ণ হইবার পর যৌবনকাল আরম্ভ হয়। ১৬ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যৌবনকাল বলা যায়। এই সময় যুবক বা যুবতীর মন ভাবাবেগে পূর্ণ থাকে। এই সময়কে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাও বলা হইয়া থাকে। অবশ্য প্রাপ্ত-বয়স্কের বয়সের সীমা ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমেরও অধিক। এই সময় মানুষের শক্তি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং এই সময় বিবেচনা করিয়া চলিবার উপরই যে কোন মানুষের জীবনধারা নির্ভর করে।

কিশোর বয়সের যাহা ধর্ম্ম, যৌবনেও তাহার অধিকাংশ লক্ষিত হইয়া থাকে। অবশ্য বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যৌবনকালে মানুষ সব কিছু ভোগ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। দেখিতে হইবে এই ক্ষমতার যেন কোন অপব্যবহার না হয়। অভিভাবকের কর্ত্তব্য হইল সন্তানের যৌবনকালে তাহার সহিত মিত্রবৎ আচরণ করা এবং তাহাকে সৎপথে চলিতে সাহায্য করা। যৌবনকালে বিপথগামী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং যাহাতে কোনরূপ অবাঞ্ছিত কিছু না ঘটে সে বিষয়ে যুবকযুবতী-গণের বিশেষ সাবধানে চলা কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গ ও উচ্চ আদর্শ মানুষকে দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করিতে পারে। প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তি

কোন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা এবং পেশা বা বৃত্তি তাহার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা মানসিক সুস্থতার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, নানাপ্রকার ব্যক্তি একই সমাজে স্থান পাইতেছে। যে কোন পল্লীতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক একত্র বাস করিতেছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে নিজ অভিলষিত বিষয় কিছু বর্জ্জন এবং অনভিপ্রেত বিষয় কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সমাজের মঙ্গল বিধান করিতে হইবে। যে নিজেকে সমগ্র সমাজের একটী অংশ মাত্র ভাবিতে না পারিবে, যে বহির্জগতের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিবে অথবা আপন স্বার্থচিন্তায় বিভোর হইয়া নিজের স্বার্থ অপরের স্বার্থ হইতে পৃথক ভাবিবে, সে সহজেই মানসিক সুস্থতা হইতে বঞ্চিত হইবে। সে ক্রমশঃ আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া, বহির্জ্জগতের সহিত সামঞ্জস্য হারাইয়া নানারূপ মানসিক ক্লেশ পাইবে। অবশেষে তাহার মানসিক বৈকল্যও ঘটা সম্ভব।

যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তথা যে কোন জাতির পক্ষে অপর সকলের সহিত সংশ্রবশূন্য হইয়া বাস করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান জগতে সকলেই পরস্পরের উপর অল্পাধিক পরিমাণে নির্ভরশীল। অতএব সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে জীবন যাপন করিতে পারা যায় সেরূপভাবে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম তাহা বর্জ্জন না করিয়া এমনভাবে চলিতে হইবে যেন প্রত্যেকের কার্য্যদ্বারা সমগ্রভাবে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। এই স্থানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আপন স্বার্থেই সকল লোক কার্য্য করিয়া থাকে, এবং কোন কার্য্য বা বিষয়ে নিজের স্বার্থ না থাকিলে সে কার্য্য বা বিষয়ে কেহ মনোনিবেশ করিতে পারে না; সুতরাং আত্মমগ্ন না হইয়া উপায় কি?

ইহার উত্তর এই। সত্য বটে জগতে প্রত্যেকেই নিজের অতি প্রিয়, কিন্তু নিজের কোন অংশ অতি প্রিয় সেই প্রশ্ন উঠিলে দেখা যাইবে যে, নিজের আত্মাই সর্ব্বাধিক প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—

"সর্ব্বেষামপি ভূতানং নৃপস্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভঃ তয়ৈব হি॥ ৫০।
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥ ৫১।
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্॥ ৫২।

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ৫৩।
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৪।
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী বাভাতি মায়য়া ॥ ৫৫।
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬।
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্ ॥" ৫৭।

(১০ স্কঃ ১৪ অঃ)

অর্থাৎ শুকদেব বলিলেন—রাজন্, সকল প্রাণীর আত্মাই প্রিয়, সন্তানাদি ও বিত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু আত্মপ্রীতি সাধন করে বলিয়াই মানুষের প্রিয় হইয়া থাকে। হে মহারাজ, এই নিমিত্তই দেহীদিগের অহঙ্কারাস্পদ নিজ নিজ দেহে যদ্রূপ মমতা হয়, পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতে তদ্রূপ হয় না, অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সব কিছুই বিসর্জ্জন দিতে পারে। যে সকল লোক দেহকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করে তাহারাও দেহকে যত প্রিয়তর মনে করে দেহ-সম্বন্ধীয় পুত্রাদিকে তদ্রূপ মনে করে না। দেহকে মমতা করে সত্য তথাপি তাহা আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে না, যে হেতু দেহ জীর্ণ হইলেও বাঁচিবার আশা কখনও হ্রাস পায় না, বরঞ্চ জীবিত থাকিবার

প্রবল আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান থাকে। অতএব দেহিগণের আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। রাজন্, তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহীর আত্মা বলিয়া জান। তিনি জগতের হিতার্থ মায়াদ্বারা এখানে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। **আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রত্যেক দেহীরই আত্মা তাহা জানিতে হইবে।** মায়ামুগ্ধ হইয়া কামনা বাসনার দাস হইয়া মানুষ আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যাইয়া অপরাপর সকলকে পৃথক মনে করিয়া নানারূপ ক্লেশ পাইয়া থাকে। বিষয়াসক্তি মানুষকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে দেয় না—মুখে বলিয়া থাকে জগন্ময়, কিন্তু মনে স্বীকার করিতে পারে না। যেমন, যে চক্ষুর সাহায্যে জগতের যাবতীয় বস্তু দেখা যায় সে চক্ষুদ্বারা নিজ চক্ষু দেখা যায় না, তেমনি আত্মস্বরূপ নারায়ণ দেহে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া মানুষ সব কিছু করিতেছে, অথচ সেই নারায়ণকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। শ্রীহরি কৃপা করিয়া সর্ব্বমানবের হিতার্থ মায়াবৃত হইয়া দেহীর ন্যায় বসুদেবের সন্তানরূপে প্রকাশ পাইতে-ছেন। একবার বল, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", তখন তোমার আত্মাকে বুঝিতে পারিবে। তখন বুঝিবে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার আত্মা, তিনিই অখিল বিশ্বসংসারের সকল দেহীরই আত্মা। যখন এই জ্ঞান জন্মিবে তখন দ্বন্দ্বরহিত হইয়া তুমি পরম শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারিবে। বস্তুতঃ যে সকল পুরুষ সর্ব্বজগতের কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাহাদের নিকট স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়। তাহারা জানেন যে, তদ্ব্যতীত অন্য

কোন বস্তুই এই সংসারে বর্ত্তমান নাই। মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার ইহাই মূলমন্ত্র। ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তি সর্ব্বজীবে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

অপর পক্ষে বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তি স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারে না, এবং অতি সহজেই কলহ বিবাদে মত্ত হইয়া থাকে। ফলে সহজেই পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে এবং মনকে অশান্ত করিয়া তোলে।

সামাজিক সম্বন্ধ সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে আরও অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। সামাজিক মিলনের মধ্যেই নিজের ত্রুটী ধরা পড়ে এবং তাহা সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।

সমাজস্থ ব্যক্তিগণের সহিত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। তাহা হইলে দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া সুস্থ মনে এই সংসারে বাস করা সম্ভব হইবে। যে সমাজে আমরা বাস করিয়া থাকি সেখানে আমাদিগকে এরূপ আচরণ করিতে হইবে যেন তাহা দেখিয়া অপর সকলে তাহাদের নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন ব্যক্তি নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর সহকর্ম্মীদিগের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব পৃথক থাকিতে চাহে। এইরূপ অভ্যাস বর্জ্জনীয়, কারণ ইহাতে

মানবের মনের শান্তি নষ্ট হইয়া থাকে। সহকর্ম্মীদিগের সহিত কেবল কার্য্যোপলক্ষে কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। অবসর সময়েও তাহাদের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন এবং পরস্পর মনোভাব বিনিময় করা সমীচীন। আমোদ প্রমোদের সময়ও তাহাদিগকে বর্জ্জন করা উচিত নহে। অবশ্য ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, দশজনের সহিত এমনভাবে জড়িত হইতে হইবে যে বিশ্রামলাভের বিঘ্ন ঘটিবে। সেরূপ অবস্থাও কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। সর্ব্বত্রই সংযমের প্রয়োজন আছে।

মানুষের **পেশা বা বৃত্তির** উপর তাহার মানসিক অবস্থা অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। জীবনধারণের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করা আবশ্যক। যে কোন বৃত্তিই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতেই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারা যায় সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কোন কার্য্য করিতে পারা যায়। জনগণের সেবা করিবার মনোবৃত্তি লইয়া কার্য্য করিলে মন শান্ত থাকিবে। অপর পক্ষে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তায় মগ্ন হইলে অচিরেই মানসিক সুস্থতা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে।

দারিদ্র্য ও সম্পদ্

দারিদ্র্য ও সম্পদ্ মানুষের মনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু কোন লোক যদি বুদ্ধি বিবেচনা

পূর্ব্বক জীবন যাপন করে তবে দারিদ্র্য বা সম্পদ্ কোনটাই তাহার মনকে সহজে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। দারিদ্র্য মনকে যথেস্ট পরিমাণে পীড়া দিয়া থাকে এবং মানুষের সুখ ও সুবিধাকে সীমাবদ্ধ করে। অবশ্য যেরূপ সুখ সুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল তাহা প্রায়শঃ কাল্পনিক। বিশ্রাম, আনন্দ ও শিক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলেও লাভ করা সম্ভব। কিন্তু কেহ যদি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উদরান্ন সংস্থান করিতেই তাহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় হইয়া যায়। কোনরূপ জ্ঞানালোচনা অথবা বিশ্রামসুখ ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটে না।

দারিদ্র্য অশেষ দুর্গতির কারণ হইলেও মানসিক সুস্থতা নস্ট করিবার পক্ষে খুব প্রবল নহে। মানুষের চিন্তা ভাবনাই তাহার মনের অসুস্থতা উৎপাদন করিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তি অনেক সময় হীনমন্যতায় কস্ট পাইয়া থাকে। দরিদ্রের মনের কষ্ট তাহার প্রতিবেশীকে দেখিয়াই অধিক হয়। চারিপার্শ্বে অর্থবান লোকের পার্থিব সম্পাদ্ দেখিয়া তাহার মনে এই ভাব উঠাই স্বাভাবিক যে, এই সংসারে বিচার নাই। ফলে তাহার মনে হতাশভাব আসে, জীবন অসার বলিয়া বোধ হয়, তাহার মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং অবশেষে তাহার পৌরুষ নষ্ট হইয়া যায়। দারিদ্র্য অবস্থায় যখন এই পৌরুষ নষ্ট হয় তখনই মানুষ প্রকৃত দরিদ্র হইয়া পড়ে। যে সকল লোক ঘটনাচক্রে দারিদ্র্য দশায় পতিত হয় তাহাদের ইহা সকল সময় স্মরণ রাখা

প্রয়োজন যে, মানুষের যথার্থ সম্পদ্ হিসাবে পার্থিব সম্পাদ্ অতি তুচ্ছ ও অসার। শ্রীহরিকে স্মরণে রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে, কোন কারণেই যেন দারিদ্র্য মনের তেজঃ নষ্ট করিতে না পারে। শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে পারিলে সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়। যে কোন ব্যক্তি যেন শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বলিতে পারে—

"জানি আমি এ সংসারে
অনেক দুঃখ পাওয়া।
সবার চেয়ে বেশী দুঃখ
তোমায় ভুলে যাওয়া ॥"

পার্থিব সম্পদ্ মানুষের অফুরন্ত আনন্দের কারণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ দারিদ্র্য চিরস্থায়ী হইবে না, কিন্তু মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িলে দুর্গতি বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে দারিদ্র্য কাহারও সম্মান নষ্ট করিতে পারে না। কেন না মানুষের সম্মান অর্থের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাহার চরিত্রের উপর। এই সরল সত্য সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

ধন সম্পদ্ এবং জীবনে সাফল্য ইহার যে কোনটাই অনেক সময় চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া থাকে। যাহারা জীবনে সফলতা লাভ করিয়াছে অথবা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা প্রায়শঃ পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ

হয়। যদি কোন ব্যক্তি জীবনের মহত্তর আদর্শে চালিত না হয় তাহা হইলে তাহার সম্পদ্ তাহাকে অসংযমী করিয়া তোলে এবং সে আরামপ্রিয় হয়। তাহার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি হ্রাস পায়। সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, পার্থিব ধন সম্পদ্ মানুষকে আত্মপরায়ণ করিয়া তোলে। আত্মপরায়ণ ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়।

সাফল্য মানুষকে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ করিয়া তোলে, অপরকে অবহেলা করিতে শিখায় এবং পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অসমর্থ করে। লব্ধসিদ্ধি হইলে মানুষ নিজের ক্ষমতার উপর অহেতুক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। সাফল্য অর্জ্জনকারীর জীবনে যদি কোন মহৎ আদর্শ না থাকে, তবে তাহার মনে ক্রমশঃ অবসাদভাব জাগ্রত হয় এবং সে হতাশ হইয়া পড়ে। মূলতঃ যে কোন অবস্থাতেই শ্রীহরিকে আশ্রয় না করিয়া শান্তিলাভের আশা নাই। স্বয়ং ব্যাসদেব, যিনি মহাভারত রচনা করিয়াছেন, বেদবিভাগ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র লিখিয়াছেন, তিনিও এত সফলতা অর্জ্জন করিবার পরও বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তৎপর নারদের পরামর্শে শ্রীহরির লীলাকথা বর্ণনা করিয়া শ্রীহরিকে ভক্তি করার শ্রেষ্ঠতা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করিয়া শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করতঃ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

যে সকল লোক ঘটনাক্রমে এই দুই পার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়াছে তাহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই

ধন দৌলত ও পার্থিব সফলতা জীবনের যথার্থ আনন্দের পরিপন্থী এবং মানসিক সুস্থতা নষ্টকারী। অর্থাৎ যাহাদের বিষয়বিত্ত রহিয়াছে তাহাদের বিশেষ বিবেচনা করিয়া জীবন যাপন করা সমীচীন। ধন সম্পত্তির সহিত অবিবেচনা যুক্ত হইলে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহারা প্রচুর পরিমাণে পার্থিব সম্পদ্ অধিকার করিয়াছে তাহাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে,

"যাবদ্‌ভ্রিয়তে জঠরং
তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত
স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥" শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৪।৮

অর্থাৎ যে পরিমিত অর্থদ্বারা উদর পূর্ণ হইতে পারে সেই পরিমিত ধনেই মানবের অধিকার। যে ব্যক্তি ইহার অধিক বিত্ত সংগ্রহ করে সে তস্কর, অতএব দণ্ডনীয়।

নবম অধ্যায়

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কতিপয় সমস্যা।

এই সংসারে বাস করিতে হইলে বহুপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কতকগুলি বিশেষ সমস্যা রহিয়াছে। ইহাদের সুমীমাংসা করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। প্রধান বিষয় হইল এই যে, মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেই হইবে। সে জন্য ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যে অথবা অন্য কোনপ্রকার কার্য্যে তাহাকে অবশ্যই অপরাপর লোকের সংশ্রবে আসিতে হইবে। যে কোন একটী বৃত্তি গ্রহণ করা মানব জীবনের একটী অপরিহার্য্য বিষয়। তাহা না করিলে জীবনে সুখের আশা নাই, পরন্তু তাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে এবং চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবে। যত শীঘ্র ও দ্বিধাহীন চিত্তে কোন লোক বুঝিতে পারিবে যে, যে কোন কাজ হউক তাহাকে করিতেই হইবে এবং পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া সানন্দে ও সুষ্ঠুভাবে তাহাকে সেই কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, তত শীঘ্র ও সহজে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। দেখিতে হইবে সেই উদ্দেশ্য যেন সমগ্রভাবে মানব সমাজের কল্যাণজনক হয়, সে যেন তাহার

কার্য্যের দ্বারা সকলের সেবা করিতে পারে। নিজের সুখ অথবা আর্থিক অবস্থার প্রতি যত কম দৃষ্টি রাখা যাইবে ততই মঙ্গল। যে বৃত্তিই ঘটনাক্রমে গ্রহণ করা হউক তাহা বুদ্ধি বিবেচনার সহিত প্রফুল্ল চিত্তে ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করাই শ্রেষ্ঠ পথ।

কার্য্যোপলক্ষে যে সকল সহকর্ম্মীর সহিত ঘনিষ্ট সংশ্রবে আসিতে হয় তাহাদের ভাবধারার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, সমগ্র মানব জীবনই আপোষমূলক। যদি দেখা যায় যে, কাহারও সহকর্ম্মিগণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মবিশ্বাসী, তাহা হইলে তাহাদের সহিত ভালভাবে কাজ করিতে হইলে নিজের ব্যক্তিগত ধারণা বা অভিমত অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা সমীচীন, নতুবা দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চাভিলাষ অর্থাৎ জীবনে শক্তি, সম্মান ও যশের অধিকারী হইবার তীব্র বাসনা যাহাদের আছে, তাহাদের এই বাসনা কোন সময় উপকার এবং কোন সময় অপকারও করিতে পারে। যদি কাহারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি আনয়ন করে অথবা ধৈর্য্যসহকারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মায় তবে তাহা মঙ্গলপ্রদ। কিন্তু যদি সেই উচ্চাভিলাষ অন্যান্য লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া পশ্চাতে ফেলিবার প্রেরণা জন্মায়, কাহারও স্বাভাবিক সদ্‌বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া সঙ্কীর্ণমনা করিয়া তোলে অথবা পরশ্রী-কাতর করে, তখনই উহা নিশ্চিতরূপে অনিষ্টকারক। মানসিক

স্বস্থতা রক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, **উচ্চাভিলাষ যেন সর্ব্বদা সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত নিয়োজিত হয়।** সমাজের কল্যাণের জন্য উচ্চাভিলাষ নিয়োজিত হইলে সকলেরই মঙ্গল।

মানুষের জীবনে সকল প্রকার কার্য্যেই যে সফলতা আসিবে তাহা নহে, **ব্যর্থতাও** জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অংশ। অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া সেইভাবেই ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া তুলিবার সময় বিফলতা আসিতে পারে। বিফলতার ফলে চঞ্চল না হইয়া পুনরায় সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যর্থতা যেন কাহাকেও কর্ম্মবিমুখ না করে, অবসাদগ্রস্ত না করে। যদিই বা সেই বিশেষ কার্য্যটী কোন কারণে সফল না হইল, তবে সেই বিফলতা হইতে যাহা শিক্ষা করা হইল তাহা স্মরণ রাখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করাই শ্রেয়ঃ। মনে রাখিতে হইবে যে, কোন কার্য্যই পুরাপুরি নিষ্ফল হয় না। হয়ত আশানুরূপ সফলতা অর্জ্জন করা সম্ভব হইল না, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা লাভ হইল তাহা কার্য্যান্তরে প্রয়োগ করিলে সুফল লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

যৌন অসঙ্গতি অর্থাৎ যৌন ব্যাপারের প্রকৃত সমাধান করিবার অসামর্থ্য মানসিক স্বস্থতা নষ্ট করিয়া থাকে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। দুরদৃষ্ট বশতঃ কাহারও জীবনে ইহা ঘটিলে ইহার প্রতিকারের একমাত্র পথ হইল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক

যৌনাকাঙ্ক্ষার বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝা এবং যে উপায়ে ইহা প্রয়োজনমত দমন করা ও যথার্থ পথে চালিত করা যায় তাহা আয়ত্ত করা। ঈশ্বর-স্মরণ মানুষকে সুস্থ মনের অধিকারী করে এবং ইন্দ্রিয় দমন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির **বিবাহ** করা স্বাভাবিক কাজ। কিছু দিন পূর্ব্বেও বিবাহ করা কোন সমস্যার বিষয় ছিল না। অধুনা নানা কারণে যুবক-যুবতীগণের যথাসময়ে বিবাহ হইতেছে না। কেহ কেহ বিবাহ করিতে ভয় পাইয়া থাকে—অহেতুক দুশ্চিন্তার ফলে বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। সাধারণতঃ কুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, আদর্শ-চ্যুত হইলে অথবা শারীরিক অক্ষমতা থাকিলে পুরুষ বা নারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে। আর্থিক অনটন কদাচিৎ বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়। বিবাহ করিলেই যে বিলাস ব্যসনে সময় কাটাইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করিতে হইলে বিবাহ করা একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ কদাচিৎ মানুষকে বিব্রত করিয়া থাকে। বিবাহিত জীবনের যথার্থ সাফল্য যে কোন ব্যক্তির চরিত্রের মাপকাঠি। অর্থাৎ সুচরিত্র লোকের বিবাহিত জীবন সুখের এবং নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণ হইবে। অপর পক্ষে অসৎচরিত্র লোকের বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য সুখের অভাব এবং কলহাদি প্রায়শঃ দেখা যাইবে। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বা নারীর বিবাহ করা যে একান্ত প্রয়োজন ইহা জানিয়া মনকে এমনভাবে তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে বিবাহিত

জীবনের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করিবার শক্তি জন্মে।

বিবাহ করিয়া যে বধূকে গৃহে আনয়ন করা হইল, সে শুধু ভোগ্যা নারী নহে—পতির সহধর্ম্মিনী—ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী। বিবাহিতা নারী কেবলমাত্র পতির কামনার ইন্ধন যোগাইবে তাহা নহে, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সে হইবে সহচরী, পতির জীবনপথে সে হাতে লইবে আলোক-বর্ত্তিকা যেন তাহার পতি কখনও তমসাচ্ছন্ন না হইতে পারে। ইহাই হইবে নারীর সাধনা।

উদারতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং অপরাধসহনশীলতা বিবাহিত জীবনকে সুখময় করিয়া তোলে। যাহা কিছু ক্রটী, বিচ্যুতি ও সংশয় তাহা যেন প্রেমের স্পর্শে মধুময় হইয়া উঠে। একটী কথা স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন যে, পতী-পত্নীর সম্বন্ধ ঠিক বান্ধবের মত নহে—তাহা হইতে পৃথক এবং মধুরতর।

আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি-পত্নীকে একটী সম্পূর্ণ পুরুষ মনে করিতেন। বিবাহের উদ্দেশ্য হইল অসম্পূর্ণ পুরুষের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ পুরুষে পরিণত হওয়া। মনু বলিতেছেন—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্‌যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥

(৯ অঃ ৪৫)

অর্থাৎ পুরুষ বলিলে জায়া, আত্মা ও অপত্য এপর্য্যন্ত বুঝিতে

হইবে। ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই উভয়ের নামই পুরুষ। এই একত্ব সাধনই হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। হিন্দু বিবাহের মন্ত্রসকল অতিশয় হৃদয়গ্রাহী, যেমন—

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

বর কন্যাকে বলিতেছে—দেবতাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন। জলসকল, প্রাণবায়ু, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন। আর একটী মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছে—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতি নিযুনক্তু মহ্যম্।"
তুমি আমার সকল কাজে হৃদয় অর্পণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক, একমনে আমার কথানুসারে চলিবে, প্রজাপতি তোমাকে আমার জন্যই নিযুক্ত করুন।

বিবাহের সকল মন্ত্রেরই অর্থ হইল পতি-পত্নীকে মিলিত করিয়া সম্পূর্ণ করা। আর একটী মন্ত্রের উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য কত মহৎ। বর কন্যাকে বলিতেছে—

"ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এবং এই যে আমার

হৃদয় তাহা তোমার হৃদয় হউক। শুধু হৃদয়ের মিলনকেই শাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট মনে করেন নাই। তাই দেখা যায়, বর কন্যাকে বলিতেছে—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।"

অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং ত্বকে ত্বকে মিলন হউক। ইহাই হইল পতি-পত্নীর সম্বন্ধ। যে স্থলে এইরূপভাবে উভয়কে চলিতে হইবে সে স্থলে দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায়?

পতি-পত্নীর পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উভয়ে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন হইলেও পত্নীকে সকল সময় পতির অধীন হইয়া চলিতে হইবে। নারী অপর সকলের নিকট দেবী হইতে পারে, কিন্তু পতির আজ্ঞা পালনে তাহাকে দাসীর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে। এই সার সত্য স্মরণ রাখিতে পারিলে অনেক প্রকার অসঙ্গতি হইতে অব্যাহতি লাভ সহজ হইবে।

রমণীগণের বিষয়ে মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন—

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।"

কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিতকর্ম্মে সাহায্য করিবেন এবং দাসীর ন্যায় আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হইবেন।

দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু সবিস্তারে স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীধর্ম্ম বিষয়ে বিষ্ণুর বচন এস্থানে কিছু উদ্ধৃত করা হইল—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতং চরেৎ।
আয়ু সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ নারীগণের স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই; পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গ লাভ করেন। পতি জীবিত থাকিতে যে নারী উপবাস ব্রত গ্রহণ করেন তিনি তদ্দ্বারা পতির আয়ু হরণ করেন এবং নরকগামিনী হয়েন।

বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে লক্ষ্মি, তুমি কিরূপ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস? ইহার উত্তরে লক্ষ্মী বলিতেছেন—

"নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বালপ্রিয়াসু।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্যপেতাসু
ধর্ম্মব্যপিক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু॥

অর্থাৎ উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, সুতান্বিতা, অর্থ সঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের পূজাপ্রিয়া, গৃহপরিমার্জ্জনে তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্মকর্ম্মে

অভিনিবিষ্টা এবং দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয় তেমনি এইপ্রকার নারীগণও আমার প্রিয়।

বিষ্ণুসংহিতায়ও দেখা যায় যে, নারীর শ্রেষ্ঠতা হইল সৌভাগ্যে। যাহার সৌভাগ্য নাই তাহার নারী-জন্ম বৃথা। সৌভাগ্য শব্দের অর্থই স্বামীর ভালবাসা।

এখানে একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন। আমাদের পরিবার পিতামাতা, ভাইভগিনী প্রভৃতি লইয়া গঠিত। পত্নীকে এমনভাবে চলিতে হইবে যাহাতে সে সকলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। কিছু রূপ, কিছু লাবণ্য, কিছু হাবভাব থাকিলে পতির মনের মত হওয়া কঠিন নহে। কিন্তু পরিবারের সকলের মনের মত হইতে হইলে বধূকে সকল সময় সুবিবেচনার সহিত চলিতেই হইবে। বিবাহিত জীবন নারীর পক্ষে সুখের হইবে যদি সে মনে রাখিতে পারে যে—

"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং
পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ
প্রজানাং চানুপোষণম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।২৬

অর্থাৎ অকপটে স্বামীর সেবা করা, শ্বশুরদেবরাদির যথাযোগ্য পরিচর্য্যা করা এবং পুত্রভৃত্যাদিকে যত্নপূর্ব্বক পালন করাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সন্তান সন্ততি স্বাভাবিক ব্যক্তিমাত্রেরই কাম্য। তথাপি কোন কোন সময় পিতামাতা সন্তানগণকে পালন করিতে মানসিক উদ্বেগ বোধ করেন। বিশেষতঃ যে সকল পিতামাতা যে কোন কারণেই হউক সন্তান পালনে অক্ষম, তাহারা সন্তানদিগকে ভারস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা আরও অধিক পরিমাণে বিব্রত হয়। যাহাই ঘটুক না কেন, পিতামাতাকে সন্তান পালনের পবিত্র দায়িত্ব হাসিমুখেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সন্তানদিগকে যথাসাধ্য মানুষ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্যভিচার সর্ব্বক্ষেত্রেই মানসিক অশান্তির কারণ।* আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ইহাপেক্ষা ঘৃণিত কার্য্য আর নাই। একমাত্র সুবিবেচনার অভাব হইলেই মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে পারে।

---

*ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুলনারীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

"অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ
ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র
হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।২৬

অর্থাৎ কুলবতী রমণীগণের পক্ষে পরপুরুষ সংসর্গ সর্ব্বসময়েই নিন্দার কারণ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা যশোহানি হয় এবং কোন সুফলই পাওয়া যায় না। ইহা কষ্টসাধ্য, কেন না অনায়াসে ব্যভিচার চলিতে পারে না, সেজন্য ক্লেশবরণ করিতে হইবে। ইহা ভয়াবহ এবং শান্তি লাভের অন্তরায় হইয়া থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির যথাসম্ভব নারী-সংসর্গ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। ক্রমাগত কোন নারীর সন্নিধানে থাকিলে পুরুষের মনে ভোগলিপ্সা জাগ্রত হওয়া সম্ভব। সুবিবেচক ব্যক্তি এমনভাবে চলিবেন যাহাতে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার কোন সুযোগই না আসিতে পারে। মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা আয়াসসাধ্য। ইহাকে সময়ে দমন করিতে না পারিলে পরে দমন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দেবাদিদেব মহাযোগী মহাদেব পর্য্যন্ত মোহিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অপর সকলের আর কি কথা! নারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কত পুরুষ যে সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পুরুষের যেমন একান্তে নারীসংসর্গ বর্জ্জনীয়, তেমনি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকদেরও অনাত্মীয় পুরুষ-সংসর্গ বর্জ্জনীয়। কারণ, কখন যে কাহার মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কখনও নির্জ্জনে কোন অনাত্মীয়া নারীর সহিত বাস করা উচিত নহে। আর একটী কথা, যখন কোন নারী কোন পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিয়া থাকে, তখন সেই কামমোহিতা নারী যে দুষ্টপ্রকৃতির সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর দুষ্টা নারী না করিতে পারে এমন গর্হিত কর্ম্ম নাই।

"শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং
বচশ্চ শ্রবণামৃতম্।

হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং

স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্॥ ৪১

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা

স্বাশিষাত্মনাম্।

পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা

ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ॥ ৪২

শ্রীমদ্ভাগবত ৬স্কঃ ১৮ অঃ

অর্থাৎ যে কোন দুষ্টা স্ত্রীলোকের মুখখানি শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল এবং বাক্যও অতিশয় শ্রুতিমধুর, কিন্তু হৃদয়খানি ক্ষুরধারের ন্যায়, সুতরাং তাহার আচরণ বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য? কামাতুর পুরুষ নিজের কামবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই দুষ্টা নারীকেও আত্মতুল্য প্রিয় মনে করে এবং তাহার জন্য আত্মসম্মান, বংশমর্য্যাদা, সুবিবেচনা প্রভৃতি বর্জ্জন করে। কিন্তু কেহই সহজে সেই নারীর প্রিয় হইতে পারে না, অর্থাৎ যখনই সুযোগ পাইবে সেই নারী পুরুষের অনিষ্ট করিবে। সেই কুলটা নারী আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন পুরুষকে, এমন কি পতি, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকেও হত্যা করাইতে অথবা স্বয়ং হত্যা করিতে পারে।

এইত দুষ্টা নারীর স্বভাব, ছল চাতুরী তাহার সম্পাদ্। ইহা মনে রাখিয়া সুবিবেচক ব্যক্তির সকল সময় ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া ঝঞ্ঝাট এড়ান কর্ত্তব্য।

আর একটী কথা, নিরঙ্কুশভাবে ব্যভিচার চলিতে পারে না,

একদিন তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইবেই। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্যভিচার সর্ব্বত্রই দুঃখের হেতু। শুধু তাহাই নহে, মানুষের বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য সকলই ব্যভিচারী হইলে ম্লান হইয়া যায়।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা
কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন
স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৬।২২

স্ত্রীলোক যে পুরুষের মন হরণ করিয়া লয় তাহার বিদ্যা, তপস্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, নির্জ্জনে বাস অথবা মৌনাবলম্বনে কি লাভ? তাহার সমস্তই বৃথা। নৈতিক অধঃপতন ঘটায় ব্যভিচারী সৎসাহসে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহার জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মানসিক সুস্থতা বজায় রাখিতে হইলে ইন্দ্রিয় সংযম করিতেই হইবে এবং ব্যভিচারাদি হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখিতে হইবে।

দৈহিক পীড়া যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির হইতে পারে। সংসারে বাস করিতে হইলে সকল সময় যে শরীর নীরোগ থাকিবে তাহা নহে। ব্যাধি হইলে ধৈর্য্য সহকারে তাহার প্রতিকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবিতকালে

শরীর কখনও সুস্থ থাকিবে এবং কখনও অসুস্থ হইবে, ইহা স্মরণ রাখিয়া ব্যাধিকে জীবনের অপরিহার্য্য সহচর মনে করিয়া সেইভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাধি হইলেই হা হুতাশ করিবার কিছু নাই। ব্যাধি হইলেই জীবনের আর আশা নাই মনে করা সমীচীন নহে। ব্যাধির প্রকোপ শক্তি বিবেচনা না করিয়া অহেতুক বিহ্বল হইয়া কোন লাভ নাই।

ব্যাধিগ্রস্ত হইলে নিজেকে হীন মনে করিবার কোন হেতু নাই। সাধারণতঃ কোন পীড়া হইলে মানুষ নিজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকে। এই আত্মনিবিষ্টতা অনিষ্টকর এবং ইহা মানসিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়া থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় যতদূর সম্ভব মন প্রফুল্ল রাখা কর্ত্তব্য এবং আত্মমগ্ন না হইয়া বাহিরের দিকে নজর দেওয়া ভাল। সর্ব্বক্ষণ রোগের চিন্তা করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ইহার ফলে মানসিক বৈকল্যও ঘটিতে পারে। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সহজেই অস্থির হইয়া পড়ে এবং প্রায়শঃ কাল্পনিক যন্ত্রণায় ক্লেশ পাইয়া থাকে। চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে ব্যাধির প্রকোপ সহজেই সহ্য করা যায়। **ঈশ্বর-শরণ চিত্ত স্থির রাখিতে সাহায্য করে।**

দশম অধ্যায়

প্রৌঢ়াবস্থা

প্রৌঢ়াবস্থায় (সাধারণতঃ ৪৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) মানবের মনে কোন কোন সময় ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রায়শঃ তাহার মন নিম্নলিখিত চিন্তাগুলিতে আচ্ছন্ন হয়—

(১) বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল এই ভয়ে মন কাতর হয়;

(২) জীবনের আনন্দ ফুরাইয়া আসিল;

(৩) পূর্ব্বে যেরূপ জীবনে আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব হইয়াছে সেরূপ আর কখনও সম্ভব হইবে না; এবং

(৪) এ জীবনে অধিক চেষ্টা করিবার আর কি সার্থকতা ?

এই সময় লোকের মনে সাধারণতঃ হতাশার ভাব উদিত হয়। ফলে উৎসাহ হ্রাস পায়। জীবনের যে তেজ ছিল তাহা স্তিমিত হয়। এই সময় মানুষ বুঝিতে পারে যে, তাহার যে সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা ছিল তাহা আর এ জন্মে সিদ্ধ হইবে না। তাহার মনে হয় যে, সফলতা লাভ করিবার জন্য যাহা কিছু করিবার ছিল তাহা শেষ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও সে ভাবিয়াছিল, হয়তো জীবনে এমন সুযোগ উপস্থিত হইবে যাহাতে তাহার

অভিলষিত কার্য্য সে সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু এখন সে দেখিতে পাইতেছে যে, তাহার অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় নাই এবং তাহার জীবদ্দশায় সে সকল আর পূর্ণ হইবে না।

সৌভাগ্যক্রমে চিত্তের এই ভাবান্তর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু কেহ যদি এই সকল ভাব লইয়া বিশেষ মত্ত হয় তাহা হইলে এই ভাবান্তর স্থায়ীও হইতে পারে।

প্রত্যেকেরই ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রৌঢ়ত্ব জীবনে অবশ্যম্ভাবী। যাহাদের অকালমৃত্যু না হইবে, তাহাদের জীবনে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য পর পর আসিবেই। এই সার সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বে বিভিন্ন বয়সকালে যে সকল আকাঙ্ক্ষা মনে উঠিয়াছিল সে সকল বয়সের ধর্ম্ম। তাহার মধ্যে সকল সময় বাস্তবতার নিদর্শন ছিল না—অবাস্তব কল্পনা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

যাহাদের মনে হতাশ ভাব আসে তাহাদের বুঝা উচিত যে, **বিষয়ভোগ মানুষকে যথার্থ আনন্দ দিতে পারে না।** যাহা প্রেয় তাহাই শ্রেয় নহে। তাহারা যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য লালায়িত তাহার প্রকৃত মূল্য কি ?

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, লোভ ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া সে যেভাবে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহাকে সহিষ্ণু হইতে হইবে,

আপন আপন কর্ত্তব্য যথাসাধ্য করিতে হইবে এবং নূতন উপায়ে আনন্দ পাইতে হইবে। বিষয়-তৃষ্ণা কমাইতে হইবে এবং মনকে উদার করিতে হইবে। আর যদি এত দিন সম্ভব না হইয়া থাকে তবে এই সময় ঈশ্বর-আরাধনায় মন দিতে হইবে। জীবনের সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরে মন দিলে সুখে থাকা যায়। অল্পবয়সে হয়তো নানাবিধ বিষয় সুখের প্রলোভনে সর্ব্বসুখের আকর শ্রীহরিকে ভাবিবার আগ্রহ হয় নাই। কিন্তু এই বয়সে জীবনের হিসাব নিকাশ লইবার সময় দেখা যাইবে, সুখ পাইবার জন্য যে ব্যাকুলতা ছিল তাহাতে সুখ পাওয়া যায় নাই এবং সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানব জীবনে শান্তি পাইতে হইলে একমাত্র ব্যবস্থা হইল ঈশ্বরানুরক্তি। ভগবদ্‌প্রীতি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। কেবল মাত্র তাহাই নহে, এই সময় ঈশ্বর-চিন্তায় মন দিলে ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা বার্দ্ধক্যেও দুঃখভোগের আশঙ্কা ক্রমে হ্রাস পাইবে এবং যাহা নিশ্চিত ঘটিবে সেই মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ
পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি
বিধূনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ ১৭

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ ১৮

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে
চেত এতৈরণাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ
ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ২০
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ২১
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ২২

শ্রীমদ্ভাগবত ১স্কঃ ২ অঃ

শ্রীহরির কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূরীভূত হইবে। যাঁহার নামরূপগুণাদি শ্রবণ করা এবং কীর্ত্তন করা পরম পবিত্র কার্য্য, সেই ভক্তজনহিতকারী শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথা শ্রবণকারী পুরুষের হৃদয়স্থ হইয়া হৃদ্গত সমস্ত অশুভ কামনা বাসনা নিশ্চয়ই দূর করেন। এমন কি যে সকল ব্যক্তি নষ্টপ্রায় হইয়াছে অর্থাৎ বিপথ-গামী হইয়াছে, সেই সকল বহির্মুখ জীবেরও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিলে উত্তমশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। যাহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বরে ভক্তিমান তাহাদেরত কথাই নাই, সংশয়াচ্ছন্ন মোহজালে আবদ্ধ ব্যক্তির কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীহরিতে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে।

হৃদয়ে নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইলে, চিত্ত রজঃ ও তমোগুণ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কাম ও লোভ দ্বারা অভিভূত হয় না

অর্থাৎ চিত্তবিকার জন্মে না। সুতরাং তৎকালে চিত্ত সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়।

এই ভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি যাজনদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা লাভ লইলে এবং বিষয়াসক্তি রহিত হইলে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে সব কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদ্বারা পালিত হইতেছে এবং যাহাতে সব কিছু বিলীন হইবে সেই শ্রীহরিকে জানা যায়।

তত্ত্বজ্ঞান হইলেই আত্মস্বরূপ ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইল। তাহার পরে অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সংশয় ছিন্ন হয়, আর সুকৃতি দুষ্কৃতি নিবন্ধন অপ্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা ভোগ করিতে হয় না।

এই সকল কারণে বিবেচনাশক্তি সম্পান্ন মনীষিগণ পরমানন্দ সহকারে ভগবান বাসুদেবে সর্ব্বদা মনঃশোধিনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

একাদশ অধ্যায়

বার্দ্ধক্য :

কখন যে প্রৌঢ়ত্বের শেষ হইয়া মানুষ বার্দ্ধক্যে প্রবেশ করে তাহা সকল সময় ধরা যায় না। কেহ কেহ নানাপ্রকার শারীরিক ব্যাধি ও দুশ্চিন্তার ফলে অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক এই শেষ বয়সে মানুষের ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মনে আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, কিন্তু ভোগ করিবার মত ইন্দ্রিয় সামর্থ্যের অভাব মানুষকে বিব্রত করিয়া থাকে। যে ভাগ্যবান ঈশ্বরে মন দিতে পারিয়াছে সে শান্তিতে থাকিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অপরাপর সকলে বৃদ্ধ বয়সেও ভোগলালসা প্রবৃত্তি থাকিবার ফলে অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে দেহ জরাগ্রস্ত হয় এবং মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের ন্যূনতা হেতু চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়। এই সময় অধিকাংশ লোকই **মৃত্যুভয়ে** কাতর হইয়া থাকে। অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়েন।

যথৈহিকা মুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্
যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।১৪

ঐহিক সাংসারিক সুখে নিরতিশয় লালসাসম্পন্ন বিষয়াসক্ত মূঢ় ব্যক্তি যেমন সন্তান, কলত্র ও ধনাদি বিষয়ে চিন্তা করিয়া এই জীর্ণ দেহের অবসানকে অতি ভয়ঙ্কর ও অনিষ্টকর মনে করে, শাস্ত্রাভ্যাসাদি জনিত বিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াও কোন ব্যক্তি যদি সেই প্রকার মৃত্যুর ভয় হৃদয়ে পোষণ করে তবে তাহার শাস্ত্রাভ্যাসাদি প্রযত্ন বৃথা শ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

শুধু যে স্ত্রীপুত্রাদির চিন্তায় মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে তাহা নহে। এই জীবন শেষ হইলে কোন অজ্ঞাত স্থানে যাইতে হইবে তাহা জানা নাই। সেই অজ্ঞাত স্থানের বিভীষিকা মনকে আশ্রয় করে। মায়ামুগ্ধ মানব যতক্ষণ না শ্রীহরির চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করিবে, ততক্ষণ তাহার এই ভয় থাকিবে।

অনেকেই মনে করিয়া থাকে যে, মৃত্যু অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। সে জন্যই মৃত্যু তাহাদের নিকট বিভীষিকাময়। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক নহে। মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বেই অনুভূতি সকল লোপ পাইয়া যায়, সেই হেতু মৃত্যুকালে কষ্ট পাইবার কথা ঠিক নহে। **সংসারের যত কিছু ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, গ্লানি সব কিছুই মৃত্যু দূর করিয়া থাকে।**

বৃদ্ধ বয়সেই যে কেবল মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় তাহা নহে। যে কোন বয়সেই, এমন কি শিশুকালেও মৃত্যুভয় থাকিতে পারে। যে পরিবেশের মধ্যে শিশু লালিত পালিত হয়, সেই পরিবেশের বয়স্ক লোকদের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা শিশুর মনে গভীর রেখাপাত

করিয়া থাকে। তাই দেখা যায়, শিশুরা পর্য্যন্ত মৃত্যুকে অতিশয় ভয় করে।

শিশুদিগকে তথা সর্ব্বাবস্থায় সকলকে এই শিক্ষাই দিতে হইবে যে, **মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী*** **এবং তাহা বিভীষিকাময় নহে।** ইহা জীবের অবস্থান্তর মাত্র। মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্মে সৎকার্য্য করিলে মৃত্যুর পরে সুখের জীবন লাভ হইবে। আর ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারিলে—ঈশ্বরানুরক্তি হইলে মৃত্যুর পরে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মশাপে মহারাজ পরীক্ষিতের সর্পদংশনে মৃত্যু হইবে ইহা সুনিশ্চিত জানিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন। তদনুসারে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইবার পর তাঁহাকে বলিলেন—

"ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধি মিমাংজহি।
ন জাতঃ প্রাগ্‌ভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥ ২
ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্।
বীজাঙ্কুরবদ্দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ ॥ ৩

---

*মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহজায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।৩৮

হে বীর, জীবমাত্রেরই মৃত্যু দেহেরই ধর্ম্ম। জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আজ হউক বা শতবর্ষ পরেই হউক প্রাণীদিগের মৃত্যু নিশ্চিতরূপে ঘটিবে।

ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ ৫

শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কঃ ৫ অঃ

হে মহারাজ, তুমি মরিবে এরূপ পশুতুল্য বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। দেহ যেমন পূর্ব্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব নষ্ট হইবে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত তুমি সেরূপ নহ অর্থাৎ "তুমি" নিত্য—মরণশীল নহ।

তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াও বীজাঙ্কুরের ন্যায় কার্য্যকারণভূত নহ (দেহ হইতে দেহ জন্মিয়াছে—আত্মার তাহাতে কি আসে যায় ?), যে হেতু কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় তুমি দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত।

ঘট ভগ্ন হইলে ঘটের অন্তর্বর্ত্তী আকাশ যেরূপ পূর্ব্বের ন্যায় মহাকাশে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ দেহের মৃত্যু হইলে জীব পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। মৃত্যুভয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দূর করিতে হইবে।

মৃত্যুকে চিরনিদ্রাস্বরূপও মনে করা যাইতে পারে। এই দুঃখময় সংসারে চিরনিদ্রা অপেক্ষা শান্তির আর কি আছে ?

মৃত্যু যদি দুঃখের না হইয়া সুখেরই হয় তবে আত্মহত্যা করিলে ক্ষতি কি ? যদি কাহারও মনে এরূপ প্রশ্ন উঠে তবে তাহার উত্তর এই যে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত এড়াইবার জন্য যাহারা অপমৃত্যু

বরণ করিতে চাহে তাহারা মহা ভ্রান্ত। কারণ, মৃত্যু বরণ করিয়া দুঃখ এড়ান কাপুরুষের কার্য্য। আত্মহত্যা যে শুধু কাপুরুষোচিত কার্য্য তাহাই নহে, ইহা একটী জঘন্য রকমের নিষ্ঠুর কার্য্যও বটে। এই অপকর্ম্ম দ্বারা পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের এত দুঃখ আনয়ন করা হয় যে, জীবিত অবস্থায়ও তাহাদিগকে সেরূপ দুঃখ দেওয়া সম্ভব নহে। পরিবারস্থ সকলের নিকট ইহা বজ্রতুল্য হয়। যাহাদিগকে সে ভালবাসিত বলিয়া প্রচার করিত এবং যাহারা তাহাকে বিশ্বাস করিত তাহাদের নিকট ইহাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ আর কিছুই নাই।

আত্মহনন একটী কাপুরুষোচিত, নিষ্ঠুর ও আত্মসম্মাননাশকর নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য। আমাদের শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে অতিশয় পাপের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে যে, আত্মহত্যা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করাও দূষণীয় এবং আত্মঘাতীকে স্পর্শ করা, দাহ করা ও তাহার শ্রাদ্ধাদি করা নিষিদ্ধ। শিশুরা যখন কোন আত্মহত্যার ঘটনা জানিতে পারে, তখন তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত না হইলে কেহ আত্মহত্যা করে না। সুস্থ মনে ইহা কখনও সম্ভব হয় না। ইহা পাপ কার্য্য এবং একমাত্র মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের দ্বারাই এরূপ জঘন্য পাপ কার্য্য সম্ভব।

যাহারা দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, পৃথিবীতে এমন কোন দুঃখ নাই, এমন কোন পাপ কার্য্য নাই যাহা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন

করিলে দূর না হয়। মানবের যত দুঃখ (পাপ) আছে তাহা ঈশ্বরের নাম স্মরণে তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যায়। দুঃখ-নিরশনের জন্য আত্মনিধন চূড়ান্ত ভ্রান্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যানে আছে—

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো
জন্মকোট্যং হ সাত্মপি।
যদ্ব্যজহার বিবশো
নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ৭
এতেনৈব হ্যঘো নোঽস্য
কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি
জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ৮
স্তেন সুরাপো মিত্রধ্রুগ্
ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা
যে চ পাতকী নোঽপরে ॥ ৯
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নাম ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়ামতি ॥ ১০
ন নিষ্কৃতৈ রুদিতৈ ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।

যথা হরের্ণামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃ শ্লোক গুণোপলম্ভকম্ ॥ ১১
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে,
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্মণির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১২
সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৩
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ
সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্য বশে নাহ
পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥ ১৪
গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ
গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং
জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ১৫
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥ ১৭
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোক নাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ স্কঃ ২ অঃ

অর্থাৎ অজামিল মৃত্যুভয়ে অবশপ্রাণে সর্ব্বক্লেশনাশকারী "নারায়ণ" এই নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যদি কোটী জন্মের সঞ্চিত পাপও থাকে, তথাপি কেবলমাত্র এই নাম উচ্চারণ দ্বারাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়া গিয়াছে।

হরিনাম উচ্চারণে শুধু যে প্রায়শ্চিত্ত মাত্র হইয়াছে তাহা নহে মোক্ষসাধনও হইয়াছে।

অজামিলের পুত্রের নাম 'নারায়ণ'—মৃত্যু-শয্যায় অজামিল সেই পুত্রকে আহ্বান করিবার জন্য "নারায়ণ এস" এই বলায়, আভাস মাত্রেও যে "নারায়ণ" এই চারিটি অক্ষর উচ্চারণ করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারাই পাপী অজামিলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছিল। যে কোন প্রকারেই হউক শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্ব পাপ বিনাশ হয়।

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে স্মরণ করে ও তাঁহার নাম উচ্চারণ করে, তাহার প্রতি ভগবানের অশেষ কৃপা বর্ষিত হয় এবং ভগবানের তাহার প্রতি মমত্ব বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। সেই হেতু শ্রীহরি তাহাকে সর্ব্বক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া থাকেন। স্বর্ণচোর, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, রাজঘাতী, পিতৃহত্যাকারী, গোবধকারী কিংবা অন্য যে কোন প্রকার পাপকারীই হউক না কেন, সকল প্রকার পাপীর পক্ষেই ভগবানের নামোচ্চারণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। আকুল হৃদয়ে ভগবানের নাম করিলে, শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে

সর্ব্ব পাপ দূর হইয়া যায় এবং পুনরায় সুস্থচিত্তে সংসারে বাস করা সম্ভব হয়।

ভগবানের নাম উচ্চারণে যেমন আত্মশুদ্ধি জন্মে, বেদার্থবাদী মুনিগণ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যে সকল ব্রতাদি বিধান করিয়াছেন পাপিগণ সেই ব্রতাদি দ্বারা তেমনভাবে শুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। আর শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরির গুণরাশিও ক্রমশঃ অনুভব করিতে পারা যায়। দয়াময় শ্রীহরির শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে তাঁহার স্বরূপ তিনি ভক্তকে বুঝাইয়া দেন যাহাতে সে সর্ব্ব ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হইতে পারে। তাহা হইলে সেই প্রায়শ্চিত্ত পাপের শোধক হইতে পারে না। অতএব যাহারা পাপবুদ্ধির মূল উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের পক্ষে শ্রীহরির নাম ও গুণ কীর্ত্তনই একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, শ্রীহরির নাম স্মরণে ও কীর্ত্তনে মন নিশ্চয়ই শুদ্ধ শান্ত হইবে। অজামিল পুত্রকে ডাকিবার জন্য "নারায়ণ" এই নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভগবানের নাম করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ করেন নাই, তবে তাঁহার পাপমুক্তি কিরূপে হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, পুত্রাদির নাম ধরিয়া ডাকিবার কালে, পরিহাসচ্ছলে, গানের পাদ পূরণার্থে কিংবা অবজ্ঞা পূর্ব্বক—যে ভাবেই হউক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই সকলপ্রকার পাপ দূর হইয়া যায়।

আদর্শচ্যুত, জীবনপথে চলিতে চলিতে পদস্খলিত, ব্যর্থতাপ্রাপ্ত, কুলোকের দ্বারা লাঞ্ছিত, কামনা বাসনায় জর্জ্জরিত, মনোব্যথাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি যদি অবশচিত্তেও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করে তবে তাহাকে আর যাতনা ভোগ করিতে হয় না। শ্রীহরির পুণ্য নাম স্মরণে সকল ত্রুটী সংশোধিত হইয়া যায়।

মহর্ষিগণ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গুরু পাপে গুরু প্রায়-শ্চিত্ত এবং লঘু পাপে লঘু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন।

সেই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বিহিত ব্রতাদি, দান ও তপস্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ সকল বিনষ্ট হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাপবুদ্ধি জনিত সংস্কার তাহাতে ধ্বংস হয় না। শুধু ভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইতে পারে।

উত্তমশ্লোক ভগবানের যে নাম তাহা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ (অর্থাৎ ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এই জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক) যেরূপেই হউক উচ্চারণ করিলেই, অগ্নি-সংযোগে যেমন কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয় তেমনি ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভ্রান্তপথে চালিত না হইয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতঃ কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করা সমীচীন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও শোক মানুষের সহজাত। এই সকল ভাবকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ৪৮
মৃষা গিরস্তাহ্যসতিরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥ ৪৯
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ৫০

শ্রীমদ্ভাগবত ১২স্কঃ ১২অঃ

যাহারা ভগবানের অনন্ত মহিমা ও নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, সূর্য্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন এবং প্রবল বায়ু যেমন মেঘ বিতারিত করে, তেমনি তিনি মানুষ্যদিগের ব্যসন * দূর করিয়া থাকেন।

যে সকল বাক্যে ভগবান বিষ্ণু বর্ণিত নহেন, সুস্পষ্টরূপে জানিতে হইবে যে, তাহা অসত্য ও অসৎ কথা, আর যাহাতে

* ব্যসন—সুরাপান, পরনিন্দা, দ্যূত প্রভৃতি কামজ দোষ এবং দৌরাত্ম্য, দুষ্টতা, ক্ষতি, প্রতারণা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি ক্রোধজ দোষ।

শ্রীহরির গুণ বর্ণিত হইয়াছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গলপ্রদ এবং তাহাই পবিত্র।

ইহা সুনিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে যে, উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথা অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে, তাহাই রম্য, নিত্য নূতনভাবে রুচি-কর এবং মনের শোকসাগর শোষণকারী। শ্রীহরিকে স্মরণ রাখিতে পারিলে চিত্ত আনন্দে বিভোর থাকিবে এবং মনের হইবে তাহাই মহোৎসব।

ঈশ্বরের নাম স্মরণে রাখিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, দুঃখকষ্টে অভিভূত না হইয়া স্বাভাবিক মনোভাবাপন্ন হইতে হইবে এবং দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইবে—

"যাহা কিছু আমার জীবনে ঘটুক না কেন, আমি আমার কর-ণীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিব, দুঃখ এড়াইতে যাইয়া, ভ্রান্ত পথে চলিয়া মূর্খের মত আদর্শচ্যুত হইব না। ভগবানের নাম হৃদয়ে রাখিয়া জীবনের সুখ দুঃখ উভয়ই সমভাবে ভোগ করিব।"

—সমাপ্ত—

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত

ব্রহ্মবিদ্যামূলক

“চতুঃশ্লোকী ভাগবত”

মূল্য—২৷৷০

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত “চতুঃশ্লোকী” ভাগবতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীমদ্ভাগবততত্ত্ব সহজেই বুঝা যায়। এই দুঃখময় সংসারে যাহারা শান্তিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে শান্তিলাভ করিবেন।

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র অভিমত ঃ—

সমস্ত ভাগবতে যে সাধ্য এবং সাধনতত্ত্ব বিবৃত আছে, চতুঃশ্লোকী ভাগবতে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বীজস্বরূপে রহিয়াছে। এজন্য চতুঃ-শ্লোকী ভাগবত সর্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ৩২ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৫ পর্য্যন্ত শ্লোককে চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলা হয়। সৃষ্টির আরম্ভে কিরূপে সৃষ্টি করা হইবে, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার সুদীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল। বহু বৎসর তপস্যার পর শ্রীভগবান তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত রূপ কেমন, মায়া কি বস্তু, ভগবানের লীলা কি ব্যাপার এবং কি উপায়ে এই তত্ত্বের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে এবং পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এই সব

তত্ত্ব এই কয়টি শ্লোকে সূত্ররূপে উপদেশ করেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ, নারদের নিকট হইতে বেদব্যাস, ব্যাস হইতে শুকদেব এবং শুকমুখ হইতে মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ক্রমপরম্পরায় ভাগবততত্ত্ব জগতে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীরই ভাষ্য এবং চতুঃশ্লোকীর বিবৃতি স্বরূপ; সুতরাং চতুঃশ্লোকী বস্তুতঃ ব্রহ্মগায়ত্রীরই সংক্ষিপ্ত অর্থস্বরূপ এবং প্রণবে যে অর্থ গূঢ়ভাবে প্রণিহিত আছে, তাহারই বিস্তার।

সাধারণতঃ চতুঃশ্লোকীর পূর্ববর্তী দুইটি শ্লোকই তাহার উপক্রমণিকা স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পাঠকদের বোধসৌকর্যার্থ অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের মূল প্রশ্ন হইতে আলোচনার সূত্রপাত করা হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রকে ভিত্তি করিয়া এই আলোচনা, সুতরাং ইহা অতি দুরূহ। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকা সংযোজিত হওয়াতে বিষয়টি সুগম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চক্রবর্তিপাদের এই টীকাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজসম্মত। এই টীকাকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকারের যে ব্যাখ্যা তাহাও সরস, প্রাঞ্জল এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। ছাপা এবং কাগজ সুন্দর। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।